দাদার কথা

প্রথম অধ্যায়

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর জেলা বর্দ্ধমানের সন্নিকটে খণ্ডঘোষ গ্রামে সর্ব্বজন-পরিচিত আমার দাদা স্যার রাসবিহারী ঘোষের জন্ম হয়। আমাদের প্রপিতামহ কিছু কিছু জ্যোতিষের চর্চ্চা করিতেন। দাদা ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি সূতিকাগৃহে গিয়া নবজাত শিশুর পায়ের তলা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"এ শিশুকে সকলে যত্ন করিস্, এ মহা পণ্ডিত ও রাজা হবে।" কিন্তু পাষণ্ডদলে হরিনাম বিলানোর মত বৃদ্ধের সে কথায় কেহ কাণ দিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দাদা বলিতেন,—"খণ্ডঘোষে আমাদের বৃহৎ গোষ্ঠী, ছোট ছোট ছেলেতে বাড়ী পরিপূর্ণ, কে কার খোঁজ নেয়? কেবল সে সময়ে যিনি সংসারের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহারই ছেলে-মেয়েদের সকলে একটু আদর-যত্ন কর্‌ত। আমি টাট্‌কা-দোয়া গাই-দুধ খেতে বড় ভালবাসতাম। ভোরবেলায় একটা ঘটী নিয়ে গোয়াল-ঘরে

গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম,—'দুধ দোয়া হলে খাব বলে'। কিন্তু কর্ত্তার ছেলেরা গিয়ে আমাকে মেরে সেখান হতে তাড়িয়ে দিত। আমি কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরমার কাছে যেতাম। ঠাকুরমা আমাকে অন্যের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দুধ দুয়ে খাওয়াতেন।"

এ সময়ে মায়ের সঙ্গে দাদার বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। রাগ, অভিমান, আদর ও আব্দার যাহা কিছু সমস্ত ঠাকুরমাকে লইয়াই হইত। ঠাকুরমাকেও এই নাতিটীর জন্য বেগ পাইতে হইত বড় কম নয়। এমন দিন খুব কমই যাইত, যে দিন তাঁর এই দুর্দ্দান্ত নাতিটী বাড়ীতে একটা না একটা বিভ্রাট না বাধাইয়া বসিত। আর সে জন্য অনেকের নিকট হইতে ঠাকুরমাকে অশেষ লাঞ্ছনা গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিতে হইত। সে সব ঘটনা স্মরণ করিয়া দাদা পরিণত বয়সে অনেক সময় আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, —"আহা! আমার জন্য বুড়ী শুধু শুধু কত কষ্টই না পেয়েছিল, কিন্তু হায়, আমি তাঁকে কোন সুখই দিতে পারি নাই।" এ আক্ষেপোক্তির সময় অশ্রুতে তাঁহার অক্ষি-পল্লব সিক্ত হইতে দেখা যাইত।

সে কালের প্রচলিত প্রথা অনুসারে পাঁচ বৎসর বয়সে দাদার হাতে-খড়ি দিয়া তাঁহাকে পাঠশালে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তখন তিনি লেখা-পড়ায় মোটেই মন দিতেন না। দাদা বলিতেন, "আমি পাঠশালে 'গণ্ডায় এণ্ডা' বলা দলের ছেলে ছিলাম। পাঠশালে গিয়ে ভালমানুষটীর মত চুপ্‌টি করে বসে কেবল কোন্ ছেলেটা কি কর্‌ছে সেই সব দেখতাম—আর সর্ব্বদাই

প্রথম অধ্যায়

ভাবতাম কখন সন্ধ্যে হবে, কখন ছেলেগুলো নামতা পড়ে 'দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার' বলবে। আর যখন সেই সময়টা আসত, আমি তখন খুব গলা ছেড়ে 'দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার' বলে, মাটিতে মাথা ঠুকে একটা পেন্নাম করে পাত্তাড়ি বগলে বাড়ীর দিকে ছুট্‌তাম। তার পর বাড়ীতে এসে ডাক্‌তাম, 'ঠাকুর মা, আমি এসেছি, তুই উপরে আছিস্?' 'রাসু এসেছিস্? আয়, আমি উপরে আছি' বলে ঠাকুর মা সাড়া দিলে, আমি উপরে গিয়ে পাত্তাড়ি ফেলে দুধ গুড় দিয়ে মুড়ি ভিজিয়ে খেতাম। তার পর ঠাকুরমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে তাঁকে রাক্ষস রাক্ষসীর গল্প বল্‌তে বল্‌তাম। ঠাকুরমা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে গল্প বল্‌ত, আমি তাই শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়তাম।"

এইখানে আমাদের বংশপত্রিকা সন্নিবেশিত করিলাম। ইহা হইতে জানিতে পারা যাইবে যে, আমাদের পিতামহ পীতাম্বর ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় জগবন্ধু ঘোষ মহাশয়ের ঔরসে আমরা জন্মগ্রহণ করি। আমার দাদা রাসবিহারী ঘোষ পিতার প্রথমা পত্নীর একমাত্র পুত্র, আর কলিকাতা হাইকোর্টের বর্ত্তমান বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ ও আমরা আর চারটী ভাই —এই পাঁচজন পিতৃদেবের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত। ইহা হইতেই আমাদের সকলের পরিচয় জানা যাইবে। এখন পুনরায় দাদার কথা বলি।

জেলা বর্দ্ধমান পরগণা ও থানা খণ্ডঘোষের অন্তর্গত খণ্ডঘোষ গ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় লোকনাথ ঘোষ মহাশয়ের বংশাবলী :—

৺লোকনাথ ঘোষ—মানকুমারী।
৺দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ—অন্নপূর্ণা।
৺পীতাম্বর ঘোষ (১ম পুত্র)—যজ্ঞেশ্বরী।
৺ক্ষেত্রমোহন ঘোষ (২য় পুত্র)
৺গয়াহরি ঘোষ।
৺বলরাম ঘোষ
৺কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ
১মা পত্নী—৺জগবন্ধু ঘোষ—২য়া পত্নী
৺নবগোপাল ঘোষ।
৺রাসবিহারী ঘোষ (১ম)
শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ (২য়)
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ (৩য়)
শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ (৪র্থ)
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ (৫ম)
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ (৬ষ্ঠ)
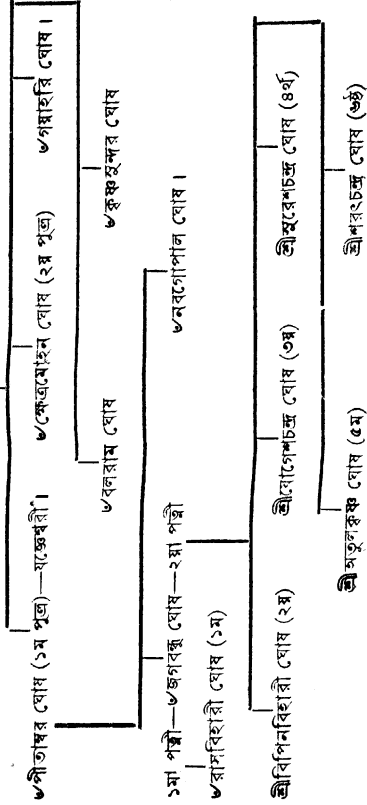
প্রথম অধ্যায়

"The child is father of the man" ইংরাজ কবির এই বিখ্যাত উক্তিটীর সার্থকতা দাদার জীবনে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তীব্র মেজাজ, জেদ, অভিমান এবং একাগ্রতা অতি শৈশব হইতেই আমরণকাল তাঁহার সমভাবে বিদ্যমান ছিল। এক দিন বাড়ীর নিকটস্থ বাগানে দাদা আম কুড়াইতেছিলেন, এমন সময় ভগী নাম্নী একজন পরিচিতা বাগ্দী রমণী তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলে—"তুই কাদের ছেলে রে?" তার এই কথাতেই আম কুড়ান ফেলিয়া দাদা কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়াইয়া বাটীতে আসিয়া ঠাকুরমাকে বলিলেন—"আমি বাগানে আম কুড়চ্ছিলাম, ভগী আমায় কেন বল্লে 'তুই কাদের ছেলে রে?" এই বলিয়াই তিনি মাটীতে পড়িয়া আছাড় কাছাড় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর মা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা অনেক সাধা-সাধনা করিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেছিলেন না; এমন সময় ভগী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ঠাকুরমা তাহাকে কপট তিরস্কার করিতে লাগিলেন। দাদা তখন শান্ত হইলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে দাদা এমন একটী কাণ্ড করিয়া বসিলেন, যাহার জন্য ঠাকুরমা একপ্রকার চিরদিনের জন্য খণ্ডঘোষের বাড়ী ছাড়িয়া গেলেন।

পুকুরে এক দিন একটা বড় মাছ ধরান হইলে দাদা বায়না ধরিলেন যে, তিনি ঐ মাছের ল্যাজাটা খাইবেন। সকলে তাঁহাকেই ল্যাজাটা খাইতে দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন; কিন্তু

আহারের সময় মাছের ল্যাজাটা কর্ত্তার এক ছেলেকে খাইতে দেওয়া হইল। সকাল হইতে দাদা যে মাছের ল্যাজাটা খাইবেন বলিয়া আশা করিতেছিলেন, এখন তাহা অন্যকে খাইতে দেওয়া হইল দেখিয়া, তিনি রাগে ভাতের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, —"আমি আজ জলে ডুবে মরব" বলিয়া পুকুরের দিকে ছুটিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া তখন কোনও প্রকারে শান্ত করা হইল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরমা এ ঘটনার কথা শুনিয়া বিষম রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—"রাসু সকাল হ'তে মাছের ল্যাজাটা খাবে বলছিল, শেষে তাকে ল্যাজাটা খেতে দেওয়া হল না—আমার বাবার পুকুরের মাছ সাত ভূতে লুটে খাচ্ছে, আর আমার নাতি সামান্য একটা মাছের ল্যাজা খেতে না পেয়ে জলে ডুবে মরতে যায়। এখানে আমি আর একদণ্ডও থাক্‌ব না। আমায় পাল্কী করে দেওয়া হোক্, আমি এখনই তোড়্‌কণা যাব।" ঠাকুরমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাটীর কর্ত্তা দাদাকে কোলে লইয়া ঠাকুরমার নিকটে গিয়া বলিলেন—"বড় বৌ, অত উতলা হইয়ো না, রাসু কটা মাছের ল্যাজা খাবে থাক্; আমি এখুনিই জেলে ডাকিয়ে মাছ ধরাচ্ছি।" কিন্তু কিছুতেই ঠাকুরমার ক্রোধের আর উপশম হইল না। তিনি সেই দিনই দাদাকে সঙ্গে লইয়া আপনার পিত্রালয়ে (তোড়্‌কণায়) চলিয়া গেলেন।

দাদা বলিতেন—"তোড়কণায় গিয়া দেখি, সেখানে আর অন্য ছেলেপিলে কেউই নাই। বাড়ীর সকলেই আমাকে কোলে-পিঠে করে,—আদর করে,—যখন যা চাই, তখনই তা পাই। সকালে

বৰ্দ্ধমানাধিপতি পরলোকগত মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুর

পৃষ্ঠা—১০

টাটকা-দোয়া গাইএর দুধ খাই। গাঁয়ে পাঠশালা নাই, পাঠশালা যেতে হয় না; কেবল ঠাকুরমার আদর—খাওয়া-দাওয়া আর খেলা নিয়ে বড় সুখেই আমার দিন কাটতে লাগল। এইরকম কয়েক মাস যাবার পর এক দিন যা এল!—হায়! হায়! তেমন কষ্টের দিন আমার শৈশবে আর কখনও আসে নাই। বাবা আমাকে ঠাকুরমার কাছ ছাড়া করে পড়বার জন্য বর্দ্ধমানে নিয়ে গেলেন। বর্দ্ধমান যাবার দিন আমার সে কি কান্না! একজন আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল; আর আমি দুহাতে তার মাথার চুল ছিঁড়ে দিচ্ছিলাম। সে আমায়—ঐ দেখ মাঠে কাঁকড়া আছে, তোমায় কাঁকড়া ধরে দেব—ঐ যে গাঁ দেখ্চ, ঐখানে ভাল পায়রা আছে, তোমায় দেব,—এই মত নানারকম করে ভুলাতে ভুলাতে বর্দ্ধমানে পৌছিয়ে দিল।”

বাবা দাদাকে বর্দ্ধমানে আনিয়া রাজ কলেজ-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এথানে থাকিয়া তিনি একটু মন দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। বাবা নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, স্কুল ব্যতীত বাড়ীতে প্রাতে দুই ঘণ্টা ও সন্ধ্যা হইতে রাত্রি নয়টার তোপ পড়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে পড়িতে হইবে।

দাদা বলিতেন—“সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিলেই আমি আস্তে আস্তে গিয়ে বাবার কাছে পড়্তে বসতাম—খানিকক্ষণ পড়েই ঘুমে আমার চোখ বুজে আস্ত—তোপ পড়বার আগে পড়া ছেড়ে উঠে যাবার যো নাই—আমি ঢুল্তে ঢুল্তে “A bag of rice, a sweet smile” (এক থলি চাল্, একটি মিষ্টি হাসি) এই কেবল জড়িয়ে

জড়িয়ে পড়্তাম। আর যেই তোপ পড়্ত, অমনি বল্তাম—'বাবা, তোপ পড়্ল—যাব ?' বাবা,—'যা' বল্লে আমি উঠে গিয়ে খেয়ে ঘুমাতাম। রাত্রে পড়্বার সময় কাণটি আমার সর্ব্বদা বাড়ীর সদর দরজার দিকে থাকৃত। যখন সদর দরজার কাছে জুতার শব্দ পেতাম, আমার মনটা বেশ খুসী হত; কারণ বুঝতাম, এইবারে কেউ আস্ছে। বাবার কাছে বসে সে গল্প কর্বে, আর আমি সেই সব শুন্ব। এরকম মাঝে মাঝে হ'ত। এক দিন একজন একতাড়া কাগজ নিয়ে এল। সেগুলো নিলামী ইস্তাহার বা ঐ রকম কিছু একটা হবে। সেই কাগজে লেখা কতকগুলা নাম বাবাতে আর তাঁতে মিলাতে লাগলেন। কাগজে ক কটা নামের পর 'ঐ, ঐ' এইরূপ লেখা ছিল। সেগুলা তাঁরা মিলাচ্ছিলেন, আর আমি পড়্তে পড়্তে আড়চোখে তাঁদের মিলান দেখ্ছিলাম। দেখি, তাঁরা যতবার মিলাচ্ছেন, প্রতিবারেই পাশের একটি 'ঐ' বাদ দিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই শেষে ঠিক মিল্ছিল না। আর তাঁরা আবার গোড়া থেকে মিলাতে আরম্ভ করছিলেন। এই রকম প্রায় ঘণ্টা দুই করার পরও যখন মিলাতে পার্লেন না, তখন তাঁরা দুজনেই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বল্লেন—নিশ্চয় কাগজটায় নকল কর্তে কোথাও ভুল হয়েছে। মুস্কিল হল ত!—বলে কাগজখানি গুটিয়ে রাখলেন। আমি ভয়ে বাবার কাছে কোনও কথা কইতাম না; কিন্তু কি জানি কেন সে সময় আমার মুখ দিয়ে ফস্ করে কেমন বেরিয়ে গেল—তা মিল্ল না কেন বল্ছেন? আপনারা যে পাশের একটা 'ঐ' ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন, তাই ত মিলছে না। তখন তাড়াতাড়ি কাগজটা খুলে বাবা

পিতা জগবন্ধু ঘোষ

ইং ১৮৯৪ সাল

পৃষ্ঠা—৮

আমায় বললেন—কই, কোন্‌টা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি—দেখা দেখি? আমি সেটা দেখিয়ে দিলে, তাঁরা আবার যখন সব মিলালেন, ঠিক মিলে গেল। তখন বাবা হাসতে হাসতে আমায় বললেন—আমরা এমন ভুল করছিলাম দেখেছিলি যদি, তবে বলিস্ নাই কেন? আমি এখন মনে মনে ভাবি, তখন ওকথা বললেই—তোমার এই দেখা হচ্ছে, না পড়া হচ্ছে,—বলেই প্রহার দিতেন আর কি। অন্য লোকটি কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে স্থির ভাবে চেয়ে থেকে বললেন—জগবন্ধু বাবু, আপনার এ ছেলেটি বাঁচলে একটি জন হবে দেখবেন। এই বয়সেই এর এত প্রখর দৃষ্টি।"

এই কথা প্রসঙ্গে দাদা বলেছিলেন—"দেখ, প্রখর দৃষ্টি হওয়াটা দরকার বটে; তার একটা বেশ দৃষ্টান্ত বলি শোন। দু'তিন বৎসর হল, একটি জাল উইলের মোকর্দ্দমা করেছিলাম। উইলের কাগজ-পত্র পড়বার আগেই দলিলের মোহরটা লক্ষ্য করতে দেখি, তার ভিতরের লেখাগুলা উল্‌টা। যে জাল মোহরটা তৈয়ারি করেছিল, সে অতটা খেয়াল করে নাই,—অক্ষরগুলা মোহরে সোজা ভাবেই খোদাই করেছিল, আর কি। কাজেই কাগজে ছাপবার সময় মোহরের লেখাগুলা উল্‌টা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যারা উইল জাল করেছে, তারা, জেলা আদালতের উকীল, মোক্তার, জজ, আরও অনেকে নিশ্চয় সে কাগজ দেখেছিল। তারা কেউ কি উইলের কাগজের আসল জিনিষ, মোহরটা ভাল করে দেখে নাই? আমি আগে সেই মোহরটা দেখেই কাগজ না পড়ে তখনই মক্কেলকে বল্‌লাম—এত স্পষ্ট জাল উইল। এর আপিলে কিছু হবে না। তখন

সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, কেন হুজুর? আমি ত নীচে আদালতে জিতেছি। আপনি কাগজপত্র পড়ে দেখুন। তখন আমি চটে তাকে বল্‌লাম—এ মোহরটা দেখ দেখি? লেখাগুলা সব উল্‌টা কেন? যে উইল ক'রেছে, তার নিজের মোহরের লেখাগুলা কি উল্‌টা আছে? তখন সে আমায় যোড় হাত করে ব'ললে—"রক্ষা ক'রতেই হবে,—নীচের আদালতে আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে,—মোকর্দ্দমা হারলে আমি একেবারে সপরিবারে মারা যাব।" তখন আমি বল্‌লাম—"শওয়াল জবাব করে মোকর্দ্দমা জিততে পারি; কিন্তু জজেরা যখন মোহর পরীক্ষা ক'রবে, তখন কি করে রক্ষা হবে? এ মোহর দেখলেই যে তারা জাল বল্‌বে!"

হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা উঠ্‌ল। তিন দিন ধরে শওয়াল জবাব হ'ল। জজেরা আমার দিকেই মত দিতে লাগ্‌লেন; কিন্তু শেষে মোহর পরীক্ষার পর মামলা টিকবে কি ক'রে, তাই ভেবেই আমি আকুল। শেষে জজেরা মোহর পরীক্ষা ক'রতে চাইলে, আমি তখন তাঁদের অন্যমনস্ক ক'রবার জন্য একটা কৌতুককর কথা পাড়লাম। জজেরা তাই শুনে হাসতে হাসতে মোহরটা পরীক্ষা করে দলিলটা ফিরিয়ে দিলেন। তখনই কি জানি কেন এই "ঐ, ঐ" মিলনের কথাটা মনে হয়েছিল।"

দাদা যে বৎসর প্রথম রাজ কলেজ-স্কুলে ভর্ত্তি হন, সেই বৎসরের শেষে পরলোকগত মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর স্কুলের ছেলেদের বাৎসরিক পরীক্ষায় পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন।

দাদা তাঁহার শ্রেণীতে পরীক্ষায় সকল ছাত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন্।

ছেলেবেলায় দাদার শরীরের তুলনায় মাথা অনেক বড় ছিল। তাই স্কুলের ছেলেরা তামাসা করিয়া তাঁহাকে 'যশুরে কই' বলিয়া ডাকিত। একে ত তাঁহার বয়স অল্প, তাহাতে তাঁহার শরীরের তুলনায় মাথা বড় ছিল বলিয়া, বয়সের অপেক্ষা আকার খুব ছোট দেখাইত। তাই দাদা মহারাজের সম্মুখে যখন পুরস্কার লইবার জন্য গিয়া দাঁড়াইলেন,—এইটুকু একটি ছেলে পরীক্ষায় তাহার শ্রেণীর সকল ছাত্রের উপর হইয়াছে দেখিয়া, মহারাজা একটু বিস্মিত হইয়া হেড মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কার ছেলে?" হেড মাষ্টার বলিলেন—"জগবন্ধু বাবুর।" দাদার হাতে পুরস্কার দিয়া তাঁহার পিট চাপড়াইতে চাপড়াইতে মহারাজা বলিলেন—"Go home." দাদা অমনি বলিলেন,—'না,—Go to your home." ইহাতে মহারাজা খানিকটা উচ্চ হাস্য করিয়া নিকটে উপবিষ্ট বাবাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"জগবন্ধু বাবু, আপ্‌কো লেড়্‌কা বহুত আচ্ছা হোগা।"

বাল্যকালে দাদার একটা প্রধান আমোদ ছিল সাঁতার কাটা। তিনি বলিতেন—"গ্রীষ্মের সময় যখন সকালে স্কুল হইত, বাবা এগারটা বারটার সময় কাছারি চলে যেতেন, আর আমি স্কুল হ'তে এসে শ্যামসায়রে সাঁতার কাট্‌তাম। গাছ হ'তে জলে ঝপাঙ্ করে লাফিয়ে পড়্‌তাম। এই রকম প্রায় প্রতি দিন দুই তিন ঘণ্টা চল্‌ত। যখন বুঝতাম, বাবার এবার কাছারি হ'তে ফিরবার সময় হয়েছে,

অমনি বাড়ী পালিয়ে যেতাম ; কিম্বা যে দিন আমায় কেউ বেশ ক'রে টুইয়ে দিয়ে মজা দেখবার জন্য বল্‌ত—'এ ছেলেটা কোনও কাজের নয়—আর বেশী সাঁতরাতে পারবে না, আলামারা হ'য়ে এসেছে' ; আমি তার মতলব বুঝে সে দিন তখনই বাড়ী চলে আস্‌তাম।"

দাদার প্রায় চারি বৎসর রাজকলেজ-স্কুলে পড়ার পর, বাবা পুলিশের ইন্‌সপেক্টারী চাকরি লইয়া বাঁকুড়ায় যান। তিনি দাদাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়া তথাকার উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঁকুড়ায় আসিয়া দাদা অধিকতর মনোযোগের সহিত পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাবা কর্ম্মোপলক্ষে মাসের অধিকাংশ দিবস স্থানান্তরে থাকিতেন বলিয়া, দাদার দুষ্টামির মাত্রা কতকটা বাড়িয়া গেল। তিনি বলিতেন—"বাঁকুড়া স্কুলের লাইব্রেরী তখন মন্দ ছিল না—অনেক ভাল ভাল ইংরাজী বই তাতে ছিল। আমি সেই সব বই খুব পড়্তাম। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠ্বার পূর্ব্বেই Scottএর 'ওয়েভারলি' নভেল সমস্তগুলি আমি পড়ে ফেলেছিলাম। স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার আমায় খুব ভালবাস্তেন। তিনি অন্যান্য মাষ্টারদের কাছে ব'লে বেড়াতেন—'আমার ছাত্র রাসবিহারীর মত ছেলে মেলা দুর্ল্লভ,—স্কুলের কোন ছেলেই তার কাছে ঘেঁস্তে পারে না।" এর জন্য কি জানি কেন হেড মাষ্টারের আমার উপর একটু ঈর্ষা হ'ত! তিনি এক দিন ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস ও থার্ড ক্লাসের ছেলেদের একটা ইংরেজী প্রবন্ধ লিখতে দিলেন। হেড মাষ্টার আমার প্রবন্ধ দেখে, সেকেণ্ড মাষ্টারকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্লেন—'রাসবিহারীর এই Essay লেখায় আপনি তাকে সাহায্য করেছেন কি না?' সেকেণ্ড মাষ্টার "না"—বলায়, আমায় ডেকে বল্লেন—'তুমি Essay লেখায় অন্যের সাহায্য পেয়েছ কি না?' আমি যেন একটু বিরক্ত ভাবে উত্তর কর্লাম—'সাহায্য আবার কার নোব'। তিনি চেঁচিয়ে বল্লেন —'যাও'। আমি খুব পা ঠুকে ঠুকে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম।"

থাক, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসিগে চল'। সেই মেয়ে মানুষ-গুলিই এদের পাঠিয়ে দিয়েছিল।

"আমি বাসায় গিয়ে দেখি, স্কুলের যত ছেলে আমাদের বাসায় এসে জড় হয়েছে, সেকেণ্ড মাষ্টারও উপস্থিত ছিলেন। আমাকে দেখে ছেলেদের খুব আহ্লাদ হ'ল। সেকেণ্ড মাষ্টার বল্লেন—'তোমার হেড মাষ্টারের আজ্ঞা মানা উচিত ছিল।' আমি বল্লাম—'সামান্য দোষে আমার অত সাজা কেন হবে? পণ্ডিত মিছে ক'রে আমার নামে হেড মাষ্টারকে লাগিয়েছিল। আমি আর এখান-কার স্কুলে পড়্‌বো না, কালই বর্দ্ধমান চলে যাব।' সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন—'যা হোক, কাল স্কুলে যেও, তার পর দেখা যাবে।' বলে তিনি বাড়ী গেলেন। ছেলেরাও সব নিজের নিজের ঘরে চলে গেল।

"তার পরদিন দশটার সময় সেকেণ্ড মাষ্টার এসে আমায় সঙ্গে করে স্কুল নিয়ে গিয়ে হেড্‌ মাষ্টারকে অনুরোধ উপরোধ করায় এই স্থির হ'ল যে, স্কুলের ছুটীর পর ক্লাসে দুই ঘণ্টা আমার আটক থাক্‌তে হ'বে। আমি তাতে রাজি হওয়ায় সবই মিটে গেল।"

বাবা বাঁকুড়া হ'তে অণ্ডালে বদলি হইয়া গেলেন। দাদা একটা বাসা ভাড়া করিয়া বামুন চাকর নিযুক্ত করিয়া বাঁকুড়াতে থাকিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার খরচের জন্য বাবা মাসিক ৩৫৲ টাকা হিসাবে দিতেন। দাদা বলিতেন—"তখনকার দিনে বাঁকুড়ায় একটা বামুন ও একটা চাকর রেখে এক জন ৩৫৲ টাকায় বেশ স্বচ্ছন্দেই থাক্‌তে পার্‌ত—এই বোঝ না। আমার বাসাটা বেশ বড়ই ছিল। অথচ তার ভাড়া মোটে আড়াই টাকা। কিন্তু বাবা যে

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমায় ৩৫৲ টাকা ক'রে দিতেন, তাতে মাস কুলত না—প্রতি মাসেই আমার আরও কিছু দেনা হ'ত। অবশ্য তারও একটা কারণ আছে। আমি অত হিসাব টিসাব দেখতাম না। সেই সুযোগ পেয়ে বামুন চাকর কিছু বেশী বেশী চুরি কর্‌ত। স্কুলের ছেলেরাও মাঝে মাঝে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোকানে মিষ্টি টিষ্টি খেত। আমিও এ রকম করে মিষ্টি খেতে বড় একটা কম ছিলাম না।" নিজের দুষ্টামি বুদ্ধির একটা কাহিনী বলি, শুন—"স্কুলের একটা ছেলে আমার নীচে ক্লাসে পড়্‌তো। বেচারি ভারি বোকা, পড়া কিছুই মনে রাখ্‌তে পার্‌তো না। আমার বাসার কাছেই তাদের বাড়ী ছিল। সে রোজ সকালে আমার কাছে এসে পড়া বলে নিত। এক দিন রবিবারে তার বাড়ীতে গিয়ে দেখি, সে ঘুমুচ্ছে। আমি তার কাণের কাছে মুখ দিয়ে—'সত্য, রাসবিহারী তোকে পড়ায়, সে তোর গুরু, তাকে ভাল ক'রে এক দিন খাওয়াস; তাহ'লে তুই পড়া কর্‌তে পারবি,' এই বলেই ছুটে ঘরে চলে এলাম। বিকেল বেলায় সত্য আমার কাছে এসে বল্‌লে—'ভাই রাসবিহারী, আমি দুপুর বেলায় ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখলাম, কে যেন এসে আমায় ধম্‌কিয়ে বল্‌লে—'রাসবিহারী তোর গুরু, তাকে ভাল করে খাওয়ালে তুই পড়া ভাল বল্‌তে পার্‌বি!' তা ভাই, তু কি খাবি বল?' আমি বল্‌লাম—ঠিকই তো, তোর আমাকে খাওয়ানো উচিত। যা, গরম গরম জিলিপি কিনে আন্‌গে। সে জিলিপি কিনে আন্‌লে নিজে বেশ করে খেলাম, তাকেও কিছু খেতে দিলাম। এ রকম প্রায় সপ্তাহ খানেক চ'লেছিল।

"আর একটা ছেলে পড়াবার কথা বলি। সেবার বড় জব্দ হ'য়ে গেছলাম। তখনকার পাড়াগাঁয়ের স্কুলে নিম্ন ক্লাসের মাষ্টার কোন দিন অনুপস্থিত থাক্‌লে, উঁচু ক্লাসের একজন ভাল ছেলেকে সেখানে পড়াতে দিত। আমি তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। আমার বড় সাধ হ'ত, এই রকম মাষ্টারি করি। কিন্তু আমার বয়স কম, আর দেখতে ছোট ছিলাম বলে, মাষ্টারেরা আমাকে কোন দিন পড়াবার কাজে দিত না। মনে বড়ই দুঃখ হ'ত। সেকেণ্ড মাষ্টারকে মাঝে মাঝে সে কথা বল্‌তাম। তার পর এক দিন অদৃষ্টে এই পড়াবার কাজ জুটল। আমি খুব স্ফূর্ত্তি ক'রে পড়াতে গেলাম।

"ক্লাসে ঢুকতেই ছেলেগুলো—'ওরে, রাসবিহারী এসেছে রে, রাসবিহারী এসেছে রে,' বলে চেঁচিয়ে গোলমাল কর্‌তে লাগ্‌ল। হাতে বেত নিয়ে 'চুপ, চুপ' করি, তবুও থামে না। ফস্ ক'রে একটা বুদ্ধি জুটে গেল। বল্‌লাম—'পাশের ঘরে হেডমাষ্টার পড়াচ্ছেন, এখনই এসে মেরে হাড় ভেঙে দেবেন।' তখন সব চুপ ক'র্‌ল। তার পর পড়াতে বসে দেখি, একটা ভালুকের গল্পে 'The Bear has a short and small tail' লেখা। এই short and small tailএর বাংলা মানে করার বিভ্রাটে পড়ে আমার মাথা ঘুরে গেল। তখন কোন রকমে মানেটা করে দিলাম বটে, কিন্তু সেই হ'তে এরকম মাষ্টারি করার সাধ আমার ঘুচে গেল।"

পূর্ব্বে দাদা গণিতে কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেন না, অঙ্কের নামে তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এক দিন দুজন প্রথম

শ্রেণীর ছাত্র একটা অঙ্ক কষিতেছিল, তিনিও সেখানে বসিয়া মনোযোগ সহকারে উহা দেখিতেছিলেন। তাহারা বারংবার কষিয়াও অঙ্কটার শেষ ফল নির্ভুল করিতে পারিতেছিল না। তখন দাদা উহার একটি স্থান দেখাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা যে নিয়মে অঙ্কটি কষিতেছ, এই স্থানটায় তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে।" তখন ছাত্রদ্বয় আপনাদের ভুল সংশোধন করিয়া লইলেন। দাদা বলিতেন—"কি জানি কেন, আমার সেই মুহূর্ত্ত হ'তেই, আগে অঙ্ক কষার যে একটা ভয় ছিল, সেটা গেল! তার পর হ'তেই আমি খুব অঙ্ক কষ্‌তাম। এম-এ পরীক্ষা আমি অঙ্কেই দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু শেষে মত বদলিয়ে গেল।"

তৃতীয় অধ্যায়

দাদা যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন, সেই সময় একজন স্কুল ইন্‌স্পেক্টার বাঁকুড়ায় স্কুল পরিদর্শন করিতে যান। তিনি ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিয়া ছেলেদের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেকেণ্ড ক্লাসে আসিয়া দাদাকে মাত্র দুইটি প্রশ্ন করিয়াই, তিনি যখন অন্য ছেলেকে প্রশ্ন করিতে যাইতেছেন, সেকেণ্ড মাষ্টার তাঁহাকে বলিলেন—"এই ছাত্রটিকে আরও দুই একটি প্রশ্ন করিয়া দেখুন।" তিনি উত্তর করিলেন—"উহাকে আর প্রশ্নের প্রয়োজন নাই, হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই সব বুঝা যায়।" এই ইন্‌স্পেক্টারবাবু ছেলেদের নিকট অনেক দেশের অনেক গল্প করিয়াছিলেন। কলিকাতার সব গল্প শুনিয়া দাদার কলিকাতা দেখিবার প্রবল বাসনা হইল; কিন্তু সে সময় তাঁর এ বাসনা পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তিনি বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। ইতোমধ্যে এক দিবস সেকেণ্ড মাষ্টার ক্লাসে বসিয়া বলিলেন—"এবারে হুগলীতে ছেলেদের পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় আমাকে ছেলেদের সঙ্গে যাইতে হইবে।" এই সুযোগে যদি হুগলী যাওয়া হয় ভাবিয়া দাদা অমনি বলিয়া ফেলিলেন—"মাষ্টার মহাশয়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন না? কলিকাতাটা দেখে আসি।"

সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"স্কুল কামাই ক'রে সে আর

কিরূপে হ'তে পারে? আগামী বৎসর তুমি ত যাবেই।" দাদা বলিলেন—"আমাকে এই বৎসরেই নিয়ে চলুন না? যেমন ক'রে হোক্ পাশটা নিশ্চয়ই ক'র্‌ব।" এই বলিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে লইয়া যাইবার জন্য তিনি মাষ্টার মহাশয়কে অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। সেকেণ্ড মাষ্টার হেড্ মাষ্টারের সমীপে দাদার অভিলাষ ব্যক্ত করিলে, তিনি বিশেষ কোনও আপত্তি না করিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। কলিকাতা কেন্দ্রে তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে ছাত্রদের লইয়া সেকেণ্ড মাষ্টার বাঁকুড়া হইতে প্রাতে যাত্রা করিলেন। তখন হাবড়া হইতে পানাগড় পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছিল। ছেলেদের পানাগড় পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইয়া রেলে চড়িতে হইবে।

সমস্ত দিবস হাঁটিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে এক গ্রামের জমিদারের গৃহে আশ্রয় লইলেন। দাদা পায়ের বেদনায় কাতর হইয়া জমিদারের বৈঠকখানায় বিছানো গালিচার উপর শুইয়া পড়িলেন। সকালে উঠিয়া দেখেন, পা ফুলিয়া কলাগাছ। চলা দূরে থাক্, উঠিয়া দাঁড়াইবারও ক্ষমতা নাই। তিনি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে পা টিপিতে লাগিলেন। সেকেণ্ড মাষ্টার তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"তুমি আর ত যাইতে পারিবে না, একটা গরুর গাড়ী করিয়া বাঁকুড়ায় ফিরিয়া যাও; আমি বাবুদের বলিয়া যাইতেছি, তাঁহারা তোমায় গাড়ী করিয়া দিবেন।"

মাষ্টার মহাশয় অন্যান্য ছেলেদের লইয়া যাত্রা করিলেন। দাদা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেন, আর পা টেপেন। কতক্ষণ এইরূপ

করার ফলেই বোধ হয় পা কিছু হালকা বোধ হইতে লাগিল। বেদনা যেন সামান্য কমিল। তখন তিনি একটা লাঠিতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যাইতে যাইতে তাঁহার পায়ের বেদনা অনেক কমিয়া আসিতে লাগিল। তখন তিনি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে চলিয়া, যে চটিতে সঙ্গীরা বিশ্রাম করিতেছিল, সেখানে উপস্থিত হইলেন। পরে তথা হইতে সকলে রওনা হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পানাগড়ে পৌঁছিলেন। সেখানে অন্য কোথাও থাকিবার আশ্রয় মিলিল না, ষ্টেশনেই থাকা স্থির হইল। মাঠের মধ্যে টিন দিয়া ঘেরা সামান্য ষ্টেশন। সেখানে আবার রাত্রে ভালুকের উপদ্রব আছে শুনিয়া দাদা ত ভয়েই অস্থির। সঙ্গীদের মধ্যস্থলে জড়-সড় হইয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন। পরে সকালের ট্রেণে চড়িয়া সকলে হুগলী যাত্রা করিলেন।

হুগলীতে গাড়ী পৌঁছিলে ছেলেরা ষ্টেশনে নামিলে, দাদাও তাহাদের সহিত নামিতেছেন দেখিয়া সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন—"রাসবিহারী, এখানে নাম্‌ছ কেন? তুমি কলিকাতা যাও, সেখানে তোমার পরীক্ষা দেওয়া স্থির হইয়াছে।"

"আমি এ'কলা কলিকাতায় যাইতে পারিব না আর পরীক্ষাও দেব না। হুগলী হ'তে আপনাদের সঙ্গে বাঁকুড়া ফিরিয়া যাইব"—বলিয়া দাদা হুগলী ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন।

পর দিবস সেকেণ্ড মাষ্টার দাদাকে বলিলেন—"হেড্‌মাষ্টারকে এ'ত বলে ক'য়ে তোমাকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এলাম, আর তুমি

এখানে এসে পরীক্ষা না দিয়া ফিরিয়া গেলে, তোমার উপর হেড্ মাষ্টার বিষম চটিয়া যাইবেন; আমাকেও দোষ দিবেন। কলিকাতায় যদি তোমার আত্মীয় কেহ থাকেন বল। আমি তোমায় লইয়া গিয়া তাঁহার কাছে পৌছাইয়া দিই। আমার কথা শোন। তুমি পরীক্ষা দাও।"

আমাদের পিশেমহাশয় কলিকাতায় কোনও সওদাগরের আফিসে চাক্‌রি করিতেন। দাদা কেবল তাহাই জানিতেন। তাঁহার বাসার ঠিকানা জানিতেন না। তিনি সেই কথা মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন। মাষ্টার মহাশয় কলিকাতায় যাইয়া পিশে-মহাশয়ের অনুসন্ধান করিয়া দাদাকে তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন।

এদিকে কে যেন দুষ্টামি করিয়া বাবাকে সংবাদ দিয়াছিল যে, দাদা স্কুলের মাষ্টারদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গিয়াছে। বাবা এই সংবাদ পাইয়া বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া পিশে-মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন যে—"রাসবিহারী কলিকাতায় পলাইয়া গিয়াছে, যদি তাহাকে খুঁজিয়া পাও, তোমার কাছে ধরিয়া রাখিও। তুমি সংবাদ দিলেই লোক পাঠাইয়া কিম্বা আমি নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিব।"

পিশে-মহাশয় প্রত্যহ আফিস যাইবার সময় দাদাকে সঙ্গে লইয়া পরীক্ষা-মন্দিরে পৌছাইয়া দিতেন; বলিয়া যাইতেন যে, আফিস হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাসায় যাইবেন। দাদা পরীক্ষা-মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পিশে-মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা

করিতেন। তাঁহার কলিকাতা দেখিবার ইচ্ছা এত প্রবল হইয়াছিল যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে এ কথা তাঁহার মনেই হইত না,—কখন লেখা শেষ করিয়া বাহিরে গিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া কলিকাতার সব দেখিবেন, এই হইয়াছিল তাঁহার প্রধান বাসনা। তাই বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া না লিখিয়া,যত শীঘ্র .পারেন তাড়াতাড়ি কতকগুলা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিয়া, তিনি প্রতি দিন রাস্তার বাহিরে আসিয়া এদিক-ওদিক দেখিয়া বেড়াইতেন ; এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে পিশে-মহাশয়ের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বক্ষণেই পরীক্ষা-মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া অপেক্ষা করিতেন।

পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইলে তিন চারি দিবস ধরিয়া কলিকাতার দর্শনীয় স্থান সমস্ত দেখিয়া দাদা তোড়কণায় চলিয়া গেলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সে বৎসর বাঁকুড়া বিভাগ হইতে অন্য কোনও ছেলে পাশ না হওয়ায়, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াও তিনি এগার টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই কথা প্রসঙ্গে অনেক সময় তিনি পরিহাস করিয়া বলিতেন—"আর যাই হোক্, পরীক্ষা দেওয়ার ভাগ্যটা আমার ভাল। পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি না পাওয়া আমার অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই। এই দেখ না সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ হ'য়েও বৃত্তি পেয়ে গেলাম।"

চতুর্থ অধ্যায়

দাদা কলিকাতায় হোষ্টেলে থাকিয়া ফার্ষ্ট-আর্টস পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। বাবাও সেই সময় মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজের হেডক্লার্কের কার্য্য লইয়া তথায় গিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। যে বৎসর দাদা এফ্-এ পরীক্ষা দেন, সেই বৎসর তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে মায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। এ দুঃখ তিনি আজীবন হৃদয়ে সমভাবে পোষণ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিতেন—"আমার পরীক্ষা নিকট বলে, বাবা মায়ের অসুখের বা তাঁর মরার খবর আমাকে দেন নাই। হায় রে, আমার পরীক্ষা! দু-বছর, চার-বছর, কিম্বা এ জীবনে নাই বা সে পরীক্ষা দেওয়া হতো! মা যে আমার চিরদিনের মত চলে গেলেন! আমি তাঁকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না, এ দুঃখ আমি রাখি কোথায়?

"বিশেষ, শেষবার যখন মায়ের কাছে যাই, মায়ের সঙ্গে রাগা-রাগি করে কলেজ খুলবার আগেই আমি কলকাতায় চলে এসেছিলাম। তার জন্য মা কত দিন খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে কাঁদা-কাটি করেছিলেন। মার কাছে আমার এ অপরাধের ক্ষমা চাওয়া আর হ'ল না।"

বড়-মা মৃত্যুকালে কমলালেবু খেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সে সময় মেদিনীপুরে কমলালেবু না পাওয়ায়, তাঁহার সে সাধ অপূর্ণ থাকিয়া যায়। দাদা সেজন্য অনেক দিন কমলালেবু খান নাই। পরিণত বয়সে মায়ের নামে পুষ্করিণী ও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া, শিবপূজার নৈবেদ্যে কমলালেবু উপকরণ দিয়া তবে কমলালেবু খাইতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন—"এখন কমলালেবু খাই বটে, কিন্তু লেবু মুখের কাছে তুললেই মায়ের কথা মনে পড়ে, খেতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকে।"

ইংরাজী ১৯০৪ সালের শেষাশেষি তিনি কোন মোকর্দ্দমা উপলক্ষে একবার মেদিনীপুরে গিয়া, যে বাড়ীতে মায়ের মৃত্যু হইয়াছিল, সেই বাড়ী দেখিতে যান। সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াই তিনি মস্তক চাপড়াইয়া সদ্যো-মাতৃ-হারা শিশুর ন্যায়—"মা! মা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মেদিনীপুরে শবদাহ করিবার বড়ই অসুবিধা শুনিয়া তিনি কাঁসাই নদীর তীরে জননীর চিতার পার্শ্বে যথোপযুক্ত অর্থ-ব্যয়ে মায়ের নামে 'পদ্মাবতী—শবদাহের ঘাট' নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

ইংরাজী ১৮৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, এফ্,-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন; এবং প্রেসিডেন্সি কলেজেই বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার সাটক্লিফ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক কোনও ছেলের হস্তাক্ষর

চতুর্থ অধ্যায়

খারাপ দেখিলে তিরস্কার করিয়া বলিতেন—'সুন্দর হস্তাক্ষর বাঙ্গালীর একটা জাতীয় গুণ, তোমরা সেটা খোয়াতে বোসেছ! মনে রেখো, একটা জাতীয় গুণ হারান কখনই উচিত নয়!" কিন্তু দাদার হস্তাক্ষর অত্যন্ত খারাপ থাকা সত্ত্বেও সাহেব তাঁহাকে কিছু বলিতেন না দেখিয়া, এক দিন একটি ছাত্র সাহেবকে বলিলেন—"মহাশয়! আপনি ত খারাপ হস্তাক্ষরের জন্য প্রায়ই ক্লাসের সকলকে ভৎর্সনা করেন, কিন্তু রাসবিহারীর যে এমন কুৎসিত হস্তাক্ষর—কৈ, তার জন্য তাকে তো এক দিনও কিছু বলেন না?" এ কথায় সাহেব একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র। সেই সময় অন্য একটি ছাত্র জনান্তিকে বলিল—"ওর তো আর হাতের লেখার দরকার হবে না!" সাহেব কথাটা শুনিতে পাইয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"এই তো, ও বুঝেছে দেখচি!"

যে বৎসর দাদা বি-এ পরীক্ষা দেন, সেই বৎসর আশ্বিন মাসের ছুটিতে তোড়কণা যাইয়া তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। কলিকাতায় আসিয়া অনেক চিকিৎসাতেও নীরোগ হইতে পারিলেন না। শেষে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তখন বি-এ পরীক্ষার মাত্র দেড় মাস সময় আছে। জ্বর ক্রমে একজ্বরে পরিণত হইল, কিছুতেই আর মগ্ন হয় না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই পরীক্ষা দিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। বন্ধুরাও তখন তাঁহার সে বৎসর আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না বুঝিয়া মনঃক্ষুণ্ন হইলেন। ডাক্তার সূর্য্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনিও এজন্য বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন। শেষে সেই হোষ্টেলে থাকিয়া

যে সব ছেলে মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া দাদাকে একটা তীব্র জোলাপ দেওয়া স্থির করিলেন। পরদিন প্রাতে সূর্য্যপ্রসাদ বাবু আসিলে, তাঁহার নিকট ছেলেরা আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সূর্য্যপ্রসাদ বাবু তাহাতে সম্মত হইয়া সেইরূপই ব্যবস্থা করিলেন। দিনে রাত্রে বারকতক খুব ভেদ হইয়া পরদিবস প্রাতে দাদার জ্বর মগ্ন হইল। কিন্তু তিনি এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, কথা কহিবারও শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না।

তখন পরীক্ষার আর সতের দিন মাত্র বাকী। যাই হোক্, আর জ্বর না আসায়, তিন চারি দিন পরেই তিনি শরীরে একটু বল পাইলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা তখন তাঁহাকে পরীক্ষা দিবার কথা বলায় তিনি বলিলেন—"এ অবস্থায় আর কি করে পরীক্ষা দিব? বস্‌লে মাথা ঘুরে যায় যে। আমি এ বৎসর পরীক্ষা দিব না স্থির করেছি!" কিন্তু শেষে সহাধ্যায়ী বন্ধুদের অনুরোধে তিনি পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিলেন।

বি-এ-তে তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরীক্ষা দিতে হইত। দাদা বাঙ্গালা তেমন ভাল জানিতেন না। পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার দাদার রচিত একটী 'বেক্‌ন সন্দর্ভ' বই দাদাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এই বই খানাই তিনি দশ পোনের দিন ধরিয়া ভাল করিয়া পড়িয়া লইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি পরীক্ষা দিতে গেলেন। তিনি পরীক্ষা-মন্দিরের বারান্দায় উঠিতেছেন, এমন সময় প্রিন্‌সিপ্যাল সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া
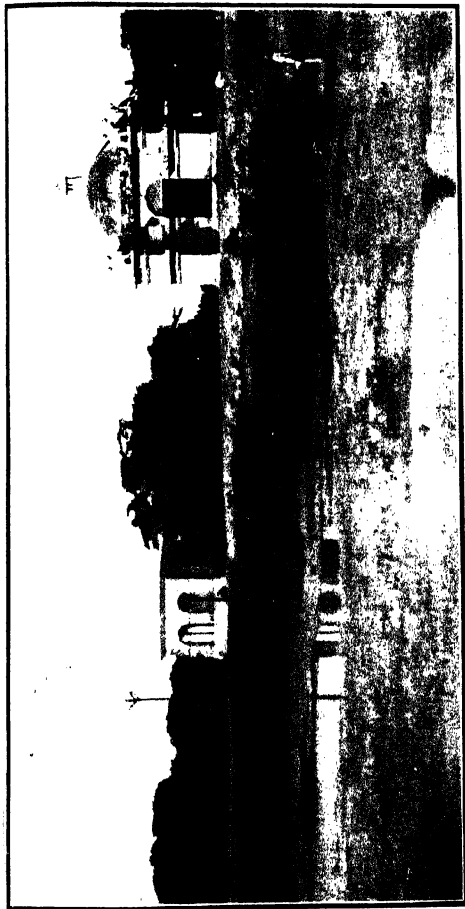
জগবন্ধু শবদাহ ঘাট

পৃষ্ঠা—৮২

ইং ১৯১২ সালে দাদা এই ঘাট বাবার নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং ইহার উদ্বোধন ক্রিয়া মহারাজা বিজয়চাঁদ

বলিলেন—"I see, you are not in the condition to Pass the examination." তার পর দাদা আস্তে আস্তে সিঁড়ি বাহিয়া দোতালায় যাইবার সময় কৃষ্ণকমল বাবুর সঙ্গে দেখা। কৃষ্ণ কমল বাবু বলিলেন—"ওরে রাসবিহারী! তুই চিঁ চিঁ করছিস, পরীক্ষা দিতে এলি কি বলে?"

পরীক্ষা দিবার কালে দুর্ব্বলতা বশতঃ সময় সময় তাঁর মাথা ঘুরিয়া যাইত। তিনি সম্মুখের টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইল। ফল বাহির হইলে দাদা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন দেখিয়া হোষ্টেলের ছাত্রেরা যখন তাঁহাকে মহানন্দে বলিলেন—"এই ত পরীক্ষা দিতেই চাও নাই। এখন পাশের মত পাশ—একেবারে দ্বিতীয় হয়ে গেলে।" দাদা উত্তর করিলেন—"এই ভয়েই ত দিতে চাই নাই!"

বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি বি-এ পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি কৃষ্ণকমল বাবুকে বলিয়াছিলেন—"স্যার, আপনাকে আমি ফাঁকি দিয়ে বাঙ্গালাটায় খুব পাশ হ'য়ে গিছি!" এই কথা শুনে কৃষ্ণকমল বাবু বলেছিলেন "না রে, না, তুই খুব মন দিয়ে বাঙ্গালাটা পড়েছিলি!" বি-এ পরীক্ষায় এই বাঙ্গালায় পাশের গল্পটা বলিয়া দাদা বড়ই আমোদ পাইতেন। এই গল্প প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন—"আমি কৃষ্ণকমল বাবুকে ফাঁকি দিয়ে বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালায় পাশ হয়েছি' —বলেছিলাম; এখন ভাবি, হয় ত সেটা কতকটা সত্য। বাঙ্গালা

পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন ছিল, 'লোকাপবাদ ভয়ে শ্রীরামচন্দ্র যে সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেটা তাঁর অন্যায় কি ন্যায়-সঙ্গত কার্য্য হইয়াছিল? ন্যায় বা অন্যায়ের কারণ দেখাও।' আমি জ্যাঠামি করে লিখেছিলাম, 'রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করে কাপুরুষ, অধার্ম্মিক ও ভীরুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁর মত লোকের রাজা হওয়া উচিত হয় নাই। বিনা দোষে ধর্ম্ম-পত্নীকে ত্যাগ করে, বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ করেছিলেন।' এই রকম যা-তা লিখেছিলাম। তাতে অনেক নম্বর ছিল, আমি প্রায় সব নম্বর পেয়েছিলাম। কিন্তু Examiner সেটা ঠিক কাজ করেন নাই। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে দিয়ে খুব ভাল কাজই করেছিলেন; রাজার কর্ত্তব্যই করেছিলেন! প্রজার মঙ্গলের জন্যই রাজা! প্রজারা যদি একটা কোনও কারণে মনঃকষ্ট পায় বা দুঃখ করে, আগে সেটা মোচন করাই রাজার সর্ব্বপ্রধান কাজ! শ্রীরামচন্দ্র তাহাই করেছিলেন। ঠিক করেছিলেন; আদর্শ রাজার কাজই করেছিলেন।"

দাদার হোষ্টেল জীবন সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন যে, হোষ্টেলের দিনগুলো তাঁহার যেরূপ ভাবে কাটিয়াছিল, তেমনটি আর জীবনে কখনও হইল না। তিনি কুল্‌পি বরফ খাইতে বড় ভালবাসিতেন। একটা লোক রোজ কুল্‌পি বেচিতে আসিত; তিনি তার হাঁড়ির প্রায় সমস্ত কুল্‌পি খাইয়া ফেলিতেন। তাই দেখিয়া অন্য ছেলেরা অবাক্ হইয়া যাইত। হোষ্টেলে নানা রকমের ছেলে ছিল ও কত রকম মজার লোক প্রতি দিন সেখানে

আসিত। পরিণত বয়সেও তিনি সেই সব লোকের কথা ভাবিতেন।

হোষ্টেলের একটী ছাত্র বড় সুন্দর ফ্লুট বাজাইতে পারিত। সে সন্ধ্যার সময় যখন ছাতে বসিয়া ফ্লুট বাজাইত, তাহা শুনিয়া দাদার চোখে জল আসিত। শেষ বয়স অবধি ও একটু দূর হইতে ফ্লুটের শব্দ শুনিলে তাঁহার চোখে জল আসিত। এমন যে কেন হইত তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। অন্য কোন বাজনার শব্দ যতই মিষ্টি হউক্ না কেন তাহাতে কিন্তু ও রকম হইত না।

একটা ছেলে তিন বার তার মাকে শ্মশানে পোড়াইয়া আসিয়াছিল। সে রাত্রিতে হোষ্টেল হইতে পলাইত। যে দিন ধরা পড়িত, সেই দিন যাই হোক একটা না একটা ওজর করিত। এই রূপে সে তিন বার তার মাকে শ্মশানে পোড়াইতে গিয়াছিল বলে। কিন্তু শেষে যখন ধরা পড়িয়া গেল, তখন হোষ্টেল হইতে সে তাড়িত হইয়াছিল।

আর এক দিন রবিবারে দুপুর বেলায় হোষ্টেলের সকলে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময় একটা লোক আসিয়া 'মাগো, মাগো' করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। হোষ্টেলের ছেলেরা তাকে, 'কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?'—জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল—'আমার মাতৃ-বিয়োগ হয়েছে,আমার কোনই সঙ্গতি নাই, আমি ভিক্ষা করে মায়ের শ্রাদ্ধ করব। আপনারা আমায় কিছু Help করুন।' এই বলিয়াই চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ফেলিয়া আবার সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ছেলেরা সকলে চাঁদা করিয়া দশ পনর টাকা তুলিয়া তাহাকে দিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে এক ব্যক্তি হোষ্টেলের একটী ছেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, সেই লোকটাকে দেখিয়া বলিল—'এ বেটা এখানে কি করছে?' তাহার পর ছেলেদের কাছে সব শুনিয়া সে বলিল—'এ বেট । জুয়াচোর, বেল্লিক, বদমাইস! আমাদের পাড়ায় একজনের বাড়ী থেকে এই রকম করে, আজ দুমাস হল, পয়সা নিয়ে গেছে। আর এক জায়গায় চুরি করে খুব মার খেয়েছিল।'

ছেলেরা এই কথা শুনিয়াই আস্তিন গুটাইয়া কেউ বা লোকটাকে মারিতে, কেউ বা পুলিশে দিতে উদ্যত হইল। দাদার সে সময় রাগ হইলেও, তাকে মার ধর করিতে বা পুলিশে দিতে তেমন ইচ্ছা হইল না। তাই ছেলেদের তিনি শান্ত করিতে গেলে, তারা তাঁহাকে ধমকাইয়া উঠিল। তিনি তখন সেই লোকটাকে বলিলেন, 'তুই তো বেশ সাজা কান্না কাঁদলি? তুই থিয়েটারে গিয়ে চাকরি করগে না?' তাহাতে সে বলিল 'সেখানে নেয় না।' তখন তিনি সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে গান টান গাহিতে জানে কি না। সে 'জানি'—বলিলে দাদা তাহাকে একটা হাসির গান গাহিতে বলিলেন। তখন সে একটা খুব মজার হাসির গান গাহিলে, দাদা তাকে আরও গান গাহিতে বলায়, সে আরও দুই একটা গাহিতেই, ছেলেরা তখন শান্ত হইয়া তাকে গান বক্তৃতা এমন কি নাচ করিতে পর্য্যন্ত ধরিয়া বসিল। এইরূপ ঘণ্টা খানিক করিবার পর তিনি বলিলেন—এখন ওকে যেতে

দাও! তখন আর তাহাতে কেহ কোনও রূপ আপত্তি করিল না দেখিয়া, তিনি আবার বলিলেন, এতক্ষণ ওর নাচ গান শুনে সব হাসলে, আমোদ আহ্লাদ করলে, ওকে কিছু দেওয়া উচিত। ইহাতে কেহই দ্বিরুক্তি না করায়, সেই চাঁদা তোলা টাকা হইতে আট দশ টাকা দিয়া তাহাকে বিদায় করা হইল। দাদা তখন খুব হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। দুই চারি জন ছেলে তাঁহার পেছু পেছু ছুটিয়া আসিয়া বলিল—তুমি এমন করে হেসে পালিয়ে এলে কেন, বল তো? তিনি বলিলেন—প্রথমে যখন লোকটাকে মার ধর না করে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলাম, তখন যে আমাকে সব তেড়ে মারতে এসেছিলে? শেষে তাকে টাকা পর্য্যন্ত দিয়ে বিদায় করলাম তো? তখন তাহারা বুঝিতে পারিয়া বলিল—ও, তুমি আচ্ছা লোক তো? আমরা মুনসেফ ডেপুটি চাকরি করব ঠিক করেছি, তুমি উকিল হয়ে যদি কখনও আমাদের কাছে মোকর্দ্দমায় যাও, তোমাকে নিশ্চয়ই হারাব, এখন হতে প্রতিজ্ঞা করে রাখলাম। নয় তো এই রকম যা তা একটা বুঝাবে তো?

দাদা উকিল হইবার অনেক দিন পরে তাঁহার সেই হোষ্টেলের সঙ্গী এক হাকিমের নিকট একটা মোকর্দ্দমায় গিয়াছিলেন। তাঁর সেই শপথ করার কথা মনে ছিল, কিন্তু তবুও তিনি তাঁকে মোকর্দ্দমাটায় জিতিয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা পালনের ইচ্ছায় সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে যাঁহারা পরবর্ত্তী জীবনে বিদ্যাবত্তা ও অন্যান্য উপায়ে সংসারে

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গল্প প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—"হোষ্টেলের আর একটী লোকের কথা বলি শোন—এখন তাঁর অনেক পয়সা হয়েছে, কল্‌কাতায় বাড়ী ঘর করেছেন, তাঁর বইএর দোকান আছে, নাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। বোধ হয় নাম শুনেছ ? এমন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক, বাঙ্গালীর মধ্যে দেখেছি বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ তাঁর তখনকার অবস্থার মত লোকের মধ্যে। তিনি আমাদের হোষ্টেলের বাজার-সরকার ছিলেন। সামান্যই বেতন পেতেন। বোধ হয় সংসারে অনেক লোকজন প্রতিপালন করতে হতো, খুবই তাঁর টানাটানি ছিল বুঝতাম। এদিকে হোষ্টেলে বাজার-সরকারের কাজে তিনি অনেক পয়সা ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। ইচ্ছা করলে যথেষ্ট সরাতে পারতেন! কিন্তু তাঁর পরম শত্রুও কখন বল্‌তে পারে নাই,—'গুরুদাস বাবু একটা পয়সা চুরি করেছেন!' আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বাজার সরকারের এ সুখ্যাতি পৃথিবীতে কেউ করতে সাহস পাবে না!"

"তিনি মেডিক্যাল কলেজের ছেলেদের জন্যে দু'টা আলমারিতে সামান্য ডাক্তারি বইও রাখ্‌তেন। ছেলেরা বই কিনবার সময় বইএর দাম জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলতেন—'এটা এত টাকা, ওটা অত টাকা কেনা পড়েছে।' ছেলেরা 'কত দিতে হবে, জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন—'যা হোক্ দাও।' 'যা হোক্ দাও।' আমি এক দিন তাঁকে বল্‌লাম—'গুরুদাস বাবু, বেশ ব্যবসা করেছেন ? বইটার কেনা দামের উপর যদি বলেন—'যা হোক্ দাও, যা হোক্

দাও!' তবে ছেলেরা কে আর আপনাকে টাকাটা, সিকাটা দিতে চাবে? দুচার পয়সা দিয়ে সেরে দিবে।' তাতে তিনি হেসে বল্‌তেন—'তাই ঢের, তাই ঢের। তোমাদের কাছে আবার কি নেব?' অথচ দেখ, তাঁর তখন কত টানাটানি ছিল! একটা যে কথা আছে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'; কিন্তু গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে এটা কখনও খাটে নাই। অভাব তাঁর স্বভাব নষ্ট করতে পারে নাই।

"পরে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বহুবাজার কি ঐ দিকে কোথা একটা বইএর দোকান করবেন স্থির করেন। হোষ্টেলের অনেকে তাঁকে নিষেধ করে বল্‌লেন—'আপনার মূলধন বেশী নাই, আপনি এমন কাজ করবেন না; দোকান চলবে না, ঠক্‌বেন!' আমি কিন্তু জোর করে বলেছিলাম—'উনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবেন! ওঁর অমন Honesty মূলধন আছে; কেবল ওতেই উনি সফলতা লাভ করবেন!' হ'লও তো তাই! এখন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দেখ্‌চ তো? আমার খাবার সময় নাই, যাই কখন। আবার অনেক সময় ওটা মনেও থাকে না। অনেকে বলে বাঙ্গালী ব্যবসা করতে জানে না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাঁরা ব্যবসা কর্‌তে যান, তাঁদের অধিকাংশেরই Honestyটা কম। তাই ফেল মারেন।"

বি-এ পাশ করবার পরই দাদার একবার খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি গোপনে গোপনে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ হইত। এ সম্বন্ধে দাদা

বলিয়াছিলেন—"খ্রীষ্টান হবার দিন গোপনে হোষ্টেল হইতে বেরিয়ে গেলাম। গীর্জার কাছাকাছি গেছি, তখন এমন একটা বিঘ্ন ঘটুল যে, আমার আর খ্রীষ্টান হওয়া হ'ল না।

"বিঘ্নটী এই—আমি গীর্জ্জায় ঢুক্‌ছি, এমন সময় বাবা গিয়ে আমার হাত চেপে ধর্‌লেন। সে সময় সহসা সেখানে বাবাকে সে অবস্থায় আমার হাত ধ'রে ফেল্‌তে দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, কেমন করে বাবা আমার খৃষ্টান হবার কথা জান্‌তে পেরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

"বাবাকে বল্‌লাম—'যাক্, আপনি যখন এসে পড়েছেন, তখন আর আমি খৃষ্টান হ'ব না।' তার পর বাবার সঙ্গে হোষ্টেলে ফিরে এলাম।

"এই গুরুদাস বাবুই—আমি খৃষ্টান হব সন্দেহ করে, বাবাকে টেলিগ্রাম করেন। বাবা সেই টেলিগ্রাম পেয়েই হোষ্টেলে আসেন। আমি তখন খৃষ্টান হবার জন্য হোষ্টেল্ হতে বেরিয়ে গেছি। বাবা হোষ্টেলে সংবাদ নিয়ে গীর্জ্জায় গিয়ে আমায় ধরেন। গুরুদাস বাবু সংবাদ দিয়ে বাবাকে এনে আমার খৃষ্টান হওয়ায় বাধা দিয়েছেন, এ আমি জানতে পেরেছি শুনে, গুরুদাস বাবু ভয় পেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি আমার সঙ্গে সেদিন আর দেখা করেন নাই।

"পরের দিন সকালে আমি ঝড়ের মত ছুটে গুরুদাস বাবুর ঘরে গিয়ে, তাঁহার হাতটা ধরে খুব জোরে নাড়া দিয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড করে বল্‌লাম—'বেশ করেছেন!' এই ব'লেই সেখান থেকে চলে গেলাম।

চতুর্থ অধ্যায়

"আমি ভাবতাম, খ্রীষ্টান জাতিই জগতের মধ্যে সভ্য। লেখা-পড়া শিখে সভ্য-ভব্য হ'তে গেলে, খ্রীষ্টান হওয়া চাই-ই চাই। খ্রীষ্টান না হ'তে পারলে বৃথাই ইংরাজী লেখাপড়া শেখা, বৃথাই সব আশা। কি ভুল বিশ্বাসই আমার তখন হয়েছিল। তবে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবশ্য খুবই ভাল, খুবই মহান্। তা'বলে ক্রাইষ্টের উপদেশ বা ক্রাইষ্টকে মানতে হলে যে একটা সমাজ হতে খ্রীষ্টান্ সমাজে *যেতে হবে তার কোনও মানে নাই। বুদ্ধদেব, ক্রাইষ্ট ও চৈতন্যদেব এঁরা সকলেই অতুলনীয় স্বার্থ-ত্যাগ করে জগতের হিতার্থ মানুষকে* সভ্যতা, ভদ্রতা শিখাবার জন্যই প্রাণপাত করেছেন। এঁদের সকলকেই মানুষ মাত্রেরই সমভাবে পূজা করা উচিত। একটা গেরুয়া কাপড় পরলেই, যে বুদ্ধের কি চৈতন্যের চেলা বা গীর্জ্জায় হাঁটু গেড়ে একটা Prayer করলেই যে খ্রীষ্টান হয়, তাহা কখনই নয়। ধরতে গেলে আমি একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান। কারণ, বাইবেল সম্বন্ধে আমি পড়ে শুনে যা জানি, ক্রাইষ্টকে যেরূপ ভক্তি মান্য করি, একজন গোঁড়া খ্রীষ্টানও তা অপেক্ষা বেশী কর্‌তে পারেন কি না, সন্দেহ।

"আবার বুদ্ধ, চৈতন্যকেও আমি সমান ভক্তি শ্রদ্ধা করি। তাঁদের সম্বন্ধেও অনেক পড়েছি। একবার Ceylonএ গিয়ে ত আমি Buddhistও হতে চেয়েছিলাম—ছেলেবেলায় যেমন খ্রীষ্টান হতে গিয়েছিলাম। তা' তাতে বিঘ্ন হওয়ায় ভালই হয়েছিল! কে জানে,—তা না হলে আমায় হয় তো শেষে আজীবন মনস্তাপ করে মরতে হতো; কারণ, নিজে তো সমাজ-ছাড়া হতেমই,

আর এটা আমি কোন দিনই মনে ঠাঁই দিতে পারতাম না যে, 'আমি খ্রীষ্টান হয়েছি, ক্রাইষ্ট সর্ব্বশক্তিমান্—তাঁকে ভজনা করছি। তিনি আমার সকল পাপ ঘুচিয়ে, আমি মরলে পরে, আমায় স্বর্গে নিয়ে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখ্‌বেন।"

বি-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবার এক বৎসর পরেই ইংরাজী ১৮৬৬ সালে দাদা ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্শে এম-এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন্। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই বহু ঈপ্সিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"এই এম-এ পরীক্ষা দিবার পর কি কর্ম্মভোগই কয়দিন না কর্‌তে হয়েছিল। হোষ্টেলে থাওয়া দাওয়া করে বারটার সময় বেরিয়ে চৌরঙ্গিতে একজামিনারের বাড়ীর ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃতাম—সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে, পরীক্ষার খবর জানব বলে। বেলা বারটা হতে পাঁচটা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেও সাহেবের দেখা না পেয়ে হোষ্টেলে ফিরে আসতাম। এক এক দিন দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে দারোয়ানকে কিছু ঘুস দিয়ে তার সেই তেল-চট্‌-চটে ছারপোকা-ভরা দড়ীর খাটিয়ায় শুয়ে থাকতাম। রোদে গা পুড়ে যেতো। সেই রকম অবস্থাতেই এক এক দিন ঘুমিয়ে পড়তাম।

"এই ভাবে এক দিন রোদে খাটিয়ায় পড়ে ঘুমুচ্ছি, এমন সময় সাহেব দারোয়ানকে একটা চিঠি দেবার জন্য বাইরে এসে, আমাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে, ঘুম ভাঙ্গিয়ে, আমার সেখানে সেরূপ ভাবে পড়ে থাক্‌বার কারণ কি, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। আমি উত্তর

দিলে, সাহেব খুব চটে উঠে বললেন—'তুমি কি ভাব, তুমি ফেল হবে? এ রকমে যে রোগ হয়ে মারা গেলে। তোমার পরীক্ষার ফল জেনে কি হবে? আমি কিছু বলবো না, যাও, তুমি বাড়ী যাও।' সাহেব আমায় এই বলে বিদায় করে দিলেন।"

এম-এ দিবার পর বৎসরই দাদা বি-এল পরীক্ষা দেন। ইতিমধ্যে তিন চারি মাসের জন্য তিনি বহরমপুর কলেজে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ইংরাজী সাহিত্য ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত অধ্যাপনা করিতে হইত। বাবা তখন ঐ স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্লার্ক ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দাদা বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক শত টাকা মূল্যের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

টাকা দিলে, সে টাকাগুলার অধিকাংশ জাল দেখে তাকে পুলিশে দেয়। পুলিশ অন্য কয়জনকেও আসামী ক'রে মোকর্দ্দমা চালায়। আদালতে আসামীরা জাল টাকার কথা অস্বীকার ক'রে বললো,—'হয় ও টাকা হাবাগোবা লোকটার, না হয় স্ত্রীলোকটার। আমরা স্ত্রীলোকটার বাড়ী হ'তে চলে আসবার সময় যে টাকা দিয়েছিলাম সে জাল নয়। হাবাগোবা তা ভাল করেই দেখে নিয়েছিল।' আদালতের বিচারে হাবাগোবার শাস্তি হয়। হাইকোর্টে আপিলে দ্বারকা বাবুর কাছে সেই মোকর্দ্দমা উঠে। দ্বারকা বাবু বিচার করে হাবাগোবাকে খালাস দিয়ে অন্য কয়েক জনের মধ্যে এক জনকে দোষী ঠিক করে, তাকে সাজা দিলেন। এতে সকলেই—'অন্যায় ক'রে নির্দ্দোষকে দণ্ড দিয়েছেন', বলে' দ্বারকা বাবুকে দোষ দিতে লাগ্‌লো। এমন কি হাইকোর্টের কোনও কোনও জজ পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। দ্বারকা বাবু বড় মনমরা হয়েছিলেন। এই রায়টা দেবার দু দিন কি তিন দিন পরে সন্ধ্যার সময় আমি তাঁর কাছে গেলে, তিনি খুব দুঃখিত ভাবে বল্‌লেন—'তাই তো ভায়া! এটা কি ভুল করলাম! এর জন্য মন বড় খারাপ হয়ে আছে। সাক্ষীদের জেরা-টেরা সব বেশ করে বুঝে শুনে' আমার তো দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, যাকে সাজা দিয়েছি সেই প্রকৃত দোষী। এখনও আমার সেই ধারণা তেমনই দৃঢ় আছে। তবে কি জানি, ভুল হতেও পারে। কিন্তু সেটা কিছুতেই মনে ঠাঁই দিতে পারছি না।'

আমি দ্বারকা বাবুর বাড়ী হ'তে বাসায় ফিরে এলে, দু'চারজন,

পঞ্চম অধ্যায়

পরিচিত লোক আমার কাছে এসে দ্বারকা বাবুর সেই মোকর্দ্দমাটার বিচারের কথা তুলে' তা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক করতে লাগ্‌লো। ঘণ্টাখানেক আলোচনা করে তারা চলে গেলে, আমার মুহুরি এসে আমায় বল্‌লে—'বাবু! এ জাল-টাকার মোকর্দ্দমাটায় দ্বারকা বাবু ভুল ক'রে নির্দ্দোষ লোককে সাজা দিয়েছেন বলে যে সবাই হৈ-চৈ ক'রে তাঁকে দোষ দিচ্ছে, কিন্তু তিনি তো কিছু ভুল করেন নাই! ঠিক দোষীকে ধরেই দণ্ড দিয়েছেন।' আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি তা কি করে জানলে?' তখন সে বল্‌লে—'আজ্ঞে, যার সাজা হয়েছে, সে আমার নিকট আত্মীয়। টাকা জাল করে এক দিন স্ফূর্ত্তি করবে, এ মতলব সে কিছুদিন হ'তে করছিল। তার পর যে দিন স্ফূর্ত্তি করতে যায়, আমাকেও সঙ্গে নেবার জন্যে খুব সাধাসাধি করেছিল; তখন টাকা জাল করার কথা সব আমায় বলেছিল।'

"এই কথা জানাবার জন্য পরদিন সকালে আমি দ্বারকা বাবুর কাছে গেলাম। আমি তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি বল্‌লেন—'কি ভায়া, তুমি সু-খবর কিছু আমাকে শুনাতে এসেছ নিশ্চয়!' দেখ, মানুষের বুদ্ধি দেখ! আমি কোনও রকম বাহ্যিক ভাব প্রকাশ করি নাই; তবুও আমাকে তিনি দেখেই ও-কথা বল্‌লেন। আমি এতে একটু আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করে বল্‌লাম—'কেন?' তিনি বললেন—'নিশ্চয়! তোমার মুখ দেখে আমি তা বুঝছি।' তখন আমি তাঁকে আমার মুহুরীর সমস্ত কথা বল্‌লাম। তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললেন—'ভায়া! ভায়া!

এর চাইতে সুখবর আমার জীবনে আর কিছু আমি শুনবো না! আমি মরতে বসেছিলাম, তুমি আমায় বাঁচালে! দেখ ভায়া, সব লোকের ভুল, আমিই ঠিক কাজ করেছি।' 'আমিই ঠিক করেছি' বলে আমার হাতটা ধরে খুব ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন।

"দ্বারকা বাবুকে দেখে শুনে আমার কেমন ধারণা হয়েছে যে, কোনও একটা বিষয় ভাল করে শিখতে হ'লে সেটার সম্বন্ধে বিশেষ করে আলোচনা ক'রতে হ'বে। কেবল প্রখর বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি থাকলে চলবে না। দ্বারকা বাবুর তো অত বুদ্ধি, অত স্মরণশক্তি ছিল, কিন্তু বললে লোকে বিশ্বাস করবে না যে, তিনি ইংরাজী গ্রামারের সামান্য সামান্য অনেক বিষয় জানতেন না। একবার তাঁর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি তাঁর ছেলেকে বাঙ্গালা হ'তে খানিকটা ইংরাজী তর্জ্জমা ক'রে দিচ্ছেন। তার মধ্যে আছে— 'কতকগুলা হরিণ এক জাগয়ায় চরচে' এই রকম কিছু। তিনি হরিণের প্লুরাল (Plural) বলে দিচ্ছেন—ডিয়ার্স, ডিয়ার্স। প্রথমটা আমি কিছু বুঝতে পারি নাই। শেষে দেখি, তিনি ডিয়ারের প্লুরাল করছেন, 'ডিয়ার্স'। তখন আমি তাঁকে বললাম—'আপনি ডিয়ারের প্লুরাল ডিয়ার্স করছেন কেন? ডিয়ারের প্লুরাল ডিয়ারই, এস্ দিয়ে নয়।' তখন তিনি একটা গ্রামার এনে দেখে বললেন— 'তাই তো ভায়া! তাই তো! এ তো ভারি ভুল ক'রেছিলাম।'

"তার পর দ্বারকা-বাবুর 'ক্যান্সার' হয়। এক দিন সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখি, তাঁর বাড়ীর কাছে একটা ডোবায় তিনি সাঁতার দিতে দিতে অনবরত ডুবছেন, উঠছেন। আমায় দেখে বললেন—

'ভায়া! আর রোগ-যন্ত্রণা সহ্য হয় না! সমস্ত শরীর যেন জ্বলে যাচ্ছে, তাই এই জলে পড়ে রয়েছি! ঠিক করেছি, এইবার দেশে গিয়ে সেইখানেই মরবো!' সে দিন তাঁর সে অবস্থা দেখে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়েছিল!"

দাদা বলিতেন—"উকিল হ'য়ে প্রথম প্রথম একটাও মোকর্দ্দমা পেতাম না! এক, দ্বারকা বাবু ছাড়া আর কারও কাছ হ'তে একটু আশার কথা শুনি নাই। আমার সঙ্গী তিন চার জন, হাইকোর্টে সুবিধা নাই দেখে, এক জন পাঞ্জাবে, অন্য সকলে এখানে ওখানে চলে গেলেন। তখন দিন কতক আমারও মনটা খুব দমে পড়েছিল। এই সময় বিনা পয়সায় একটা মোকর্দ্দমা পেলাম স্যার বার্ণস্ পিককএর এজ্‌লাসে। মোকর্দ্দমার সওয়াল জবাব করবার সময় থর্-থর্ ক'রে আমার গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আমার সওয়াল জবাব শেষ হ'লে যখন বিপক্ষের উকিল সওয়াল জবাব করতে দাঁড়াল, তখন স্যার বার্ণস্ পিকক, (এমন জজ্ এপর্য্যন্ত আর হাই-কোর্টে আসে নাই!) খুব উঁচু হয়ে বসে, মাথা তুলে, আমাকে দেখিয়ে, সেই উকিলকে বল্‌লে—'What have you to say after the remarkable argument of this young jurist?'

"এ কথা শুনে হাইকোর্টময় সোরগোল পড়ে গেল। চিফ্ জাষ্টিসের (Chief Justice) এ রকম প্রশংসায় আমি ভাবলাম, এবার হ'তে নিশ্চয় কিছু কিছু ক'রে মোকর্দ্দমা পাব। কিন্তু এর জন্যে কিছুই পাই নাই। প্রায় বছর খানেক দশটার সময় খেয়ে কোর্টে

যাওয়া আর দেড়টা দুটার সময় ঘরে এসে ঘুমান। এই ক'রে দিন কাটতো। তার পর দুটো চারটে করে মোকর্দ্দমা পেতে লাগলাম।"

"তখন আমার ঘরে আসবাব-পত্র কিছুই ছিল না। মেজেতে একটা ময়লা সতরঞ্চ পেতে তাতে উবুড় হ'য়ে বসে মোকর্দ্দমার কাগজপত্র দেখতাম। একদিন বাবু শ্রীনাথ দাস আমার বাড়ীতে এসে আমার সেই অবস্থা দেখে বল্লেন—'ওহে রাসবিহারী! তুমি এ কি ক'রছ? তোমার ভিতরে যাই থাক্, 'ভেক্' কর, 'ভেক্' কর। ভেক্ না ক'রলে, ভিক্ মিল্বে না! যে মক্কেলটা তিন টাকা দেবে ভেবে তোমার কাছে আসবে, তোমার এ অবস্থা দেখে সে এক টাকার বেশী দেবে না। আর একখানা কোউচ্, একটা আলবোলা, রুপার একটা ডিবে, জলের গ্লাস ও দুই আলমারি বই এনে ঘর সাজিয়ে বসে থাক। মক্কেলটা দু-টাকা দিতে এসে, 'ভেক্' দেখে ছয় টাকার কম দিতে সাহস পাবে না।'

"দিন কতকের মধ্যে বাবু শ্রীনাথ দাসের কথামত 'ভেক্' করলাম। কিন্তু ভিক্ তাতে তো তেমন মিল্লো না!"

ইংরাজী ১৮৭১ সালে দাদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অনার্শ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। ইহার চারি বৎসর পরে ১৮৭৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় বন্ধকী আইন সম্বন্ধে বারটা বক্তৃতা দেন। ১৮৭৬ সালে এই বক্তৃতাগুলি দেওয়া শেষ হইবার পরই, তিনি সেগুলি একত্র করিয়া ছাপাইয়া পুস্তকাকারে সাধারণের জন্য প্রকাশ করেন।

ইহাই তাঁহার 'The Law of Mortgage in British India' নামক বিখ্যাত আইন পুস্তক। সমগ্র ভারতের আইন ব্যবসায়ী মাত্রেই একবাক্যে এই পুস্তককে একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

তাঁহার পুস্তকের সূচনায় তিনি নবীন উকীলদিগকে নিম্নলিখিত যুক্তিপূর্ণ সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন—

"'He knoweth not the law who knoweth not the reason of the law," is a saying which the student should always bear in mind and you will pardon me if I venture to affirm what is now accepted almost as a truism, that a careful study of general principles as illustrated in different systems of law, will not be wholly useless to you, when you enter upon the practical duties of the profession. It may not be given to every one of us to attain high forensic skill, but depend upon it, the time given to a scientific study of law is never wholly thrown away; for legal practice is not a thing apart from legal science. I must, however, warn you that laborious days are not always crowned with riches or honour, for the race is not to the swift, nor the battle to the strong, and professional distinction may be won in more ways than many of you perhaps imagine. But a higher guerdon awaits those who pursue learning for its own sake: and I invite you to join that noble band to which so many are called and so few chosen: for the dust of daily life tends to deaden those finer sentiments to which life should owe its savour. I do

not by any means ask you to live in cloistered seclusion, detached from the world and all its pursuits, but do not be too eager in the chase for money, position or power. For believe me, you can not fall into the habit of prizing, low and gross ideals without suffering deterioration in your intellectual as well as moral fibre. Learn therefore, betimes to labour and to wait; and if you are ever tempted to join in the fierce hunt after the vulgar prizes of the world, remember that after all the successful man as he is called is not unfrequently.

A poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more.

এই সম্বন্ধে তিনি একবার পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি আমার বই-য়ে ছেলেদের যে উপদেশটা দিয়েছি, তার হয় তো কেউ টীকা করবে—'চৌরঙ্গীর বাড়ীতে থেকে, টানা-পাখার হাওয়া খেয়ে, জুড়ি-গাড়ী চড়ে সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে এরকম উপদেশ তো দেওয়া বেশ চলে! কিন্তু যার উনুনে হাঁড়ী চড়ছে না, তার পক্ষে গ্রন্থকারের এই অমূল্য উপদেশ পালন করা কি করে সম্ভবপর হ'তে পারে?"

দাদা বলিতেন—"ঠাকুর আইনের বক্তৃতা দিয়ে আমি যে কয় হাজার টাকা পেয়েছিলাম, তার সমস্তই কয় বৎসর সরস্বতী পূজা করে খরচ করেছি। একটী পয়সা তার পুঁজি করি নাই বা অন্য কাজে খরচ করি নাই। সরস্বতীর কৃপাতেই তো টাকাটা পেয়েছিলাম। তাই প্রথম রোজগারের মোটা

টাকাটা তাঁরি পূজায় খরচ করলাম। পূজা করা মানে আর কি? গরিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কিছু পায়, আর দীন দুঃখীরা বৎসরে একবার পেট ভরে খায়। মানুষ হয়ে জন্মে যারা জীবনে একটী দিনও ভাল করে খেতে পায় না, তাদের ভাল করে পেট ভরে খাওয়াতে যে টাকা ব্যয় হয়, তার চেয়ে টাকার সদ্ব্যয় যে আর কিসে হ'তে পারে তা আমি ভেবে পাই না!"

কয়েক বৎসরের মধ্যেই দাদা অসাধারণ প্রতিভাবলে ওকালতীতে আপনার পশার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর তাঁহার আয়ের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াই চলিল। ১৮৮৪ সালে তিনি 'ডক্টার ইন্ ল' উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৫ সালের কাছাকাছি দাদা বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আই-সি-এস্ পড়াইবার জন্য মেজ দাদাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন স্থির হয়। যাত্রা করিবার আয়োজন উদ্যোগ প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় নিকট আত্মীয়েরা তাঁহার বিলাত যাত্রার বিরোধী হইলেন। দাদা তাঁহাদের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বিলাত যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

এ সম্বন্ধে তিনি পরে বলিতেন—"সে সময় তো বিলাত যাচ্ছিলাম, ব্যারিষ্টার হ'য়ে বেশী পয়সা রোজগার করবো ব'লে। তা তো উকিল থেকেও পূর্ণ হয়ে গেল। তখন বিলাত গিয়ে নিজের লোককে মনঃকষ্ট না দেওয়ার জন্যেই বোধ হয় এটা হ'ল।

এখন ভাবি ব্যারিষ্টার হবার জন্যে তখন বিলাত না যাওয়া ভালই হয়েছিল! সে সময় বিলাত যাওয়া তো আর এখনকার মত ছিল না। তখন বিলাত গেলে, আধা খ্রীষ্টানেরই মত হয়ে সমাজ হ'তে সরে থাক্‌তে হ'তো। আমার যা প্রকৃতি, তাতে মনে কষ্ট পেতাম নিশ্চয়ই!"

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইংরাজী ১৮৮৭ সালে দাদা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন এবং ১৮৯১ সালে তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড ল্যানস্‌ডাউন সাহেব তাঁহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত করেন। অনন্তর ল্যান্‌সডাউনের পরবর্ত্তী শাসন-কর্ত্তা লর্ড এল্‌গিন্ সাহেবও তাঁহাকে পুনরায় তিন বৎসরের জন্য উক্ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করেন। এই কয়েক বৎসর ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে তিনি যে সকল জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই সুবিদিত। 'পার্টিসান বিল ও জজমেণ্ট ডেটার্‌স্ বিল্,' এই দুই আইন প্রণয়ন করিয়া তিনি যে দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও ভিন্ন মত নাই।

দাদা বলিতেন—"কর্ত্তারা যে বুদ্ধি নিয়ে কাউন্‌সিলে আইন প্রস্তুত করেন, তার পরিচয় আমি বেশ পেয়েছি! বাঁকুড়ায় যখন আমি পড়ি, একজন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর গিয়ে আমায় দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই বলেছিলেন—'এ ছেলেকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে হ'বে না। হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই সব বুঝা যায়!' আমিও সেই রকম একটা ভাত টিপেই ওঁদের হাঁড়ির হাল সব বুঝেছি।"

"সে সময় বাঙ্গালার চারিদিকে খুব দাঙ্গা হচ্ছিল। লাট-সাহেব ঠিক করলেন—'একটা আইন করে ইহা থামাবেন। কর্ত্তারা সব পরামর্শ করে আইন্ প্রস্তুত করলেন। আমি সে আইন শুনে বল্‌লাম—'এ আইনে কিছুই হ'বে না!' কর্ত্তারা অমনি চীৎকার করে উঠলেন—'কেন হ'বে না? আইনে কি দোষ হয়েছে?' আমি বল্‌লাম—'এ রকম অত্যাচারী আইন কখনও চল্‌তে পারে না! কোন গবর্ণমেণ্টও চালাতে পারে না!' তখন লাটসাহেব হ'তে আরম্ভ করে তাঁহার পার্ষদ-বর্গ সকলেই রোখ ক'রে আমায় বল্‌লেন—'তুমি বুঝ নাই! এ অত্যাচারী আইন নয়, এ রকম আইন অন্য গবর্ণমেণ্ট চালাতে না পারুক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পারবে! তুমি দেখে নিও!' আমার বড্ড রাগ হ'লো; আমি তার কোনও উত্তর দিলাম না। আইন পাশ্ হয়ে গেল।"

"আইনটা এই—'সে সময় খুব দাঙ্গা হচ্ছিল বলে আইন হল যে, কোনও যায়গায় দাঙ্গা করবার পরামর্শ হচ্ছে বা দাঙ্গা আরম্ভ হবার সম্ভাবনা হয়েছে, এই রকম কোনও সংবাদ যদি কেহ জান্‌তে পারে, তাকে তখনই নিকটবর্ত্তী থানায় খবর দিতে হ'বে। যদি দাঙ্গা সম্বন্ধে কেহ কিছু জেনেও থানায় খবর দেয় নাই, প্রমাণ হয়, তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হ'বে।'

"যে দিন আইন পাশ হলো তার দিন চার পরে গায়ের ঝাল্ ঝাড়বার জন্য একটু হেসে কর্ত্তাদের বল্‌লাম—'দাঙ্গা

ষষ্ঠ অধ্যায়

আইন তো পাশ হল, এখন দেশে দেশে চোরের উপদ্রব খুব বাড়বে, নয় জেলখানা খুব বাড়াতে হবে।' তাঁরা 'এ কথার কারণ কি?'—জিজ্ঞাসা করায় বল্লাম—'দাঙ্গা হবার উপক্রম হয়েছে—যে জান্‌তে পারবে, তাকেই থানায় খবর দিতে হবে। এখন একটা গ্রামে দাঙ্গা হবে,—সে গ্রামের অধিকাংশ লোক তা জানতে পেরেছে—সচরাচর তাই হয়ে থাকে। এখন সেই সব লোককেই খবর দিতে থানায় ছুট্‌তে হবে, নয় তো আইন অনুসারে তাদের কঠোর শাস্তি হবে। তারা থানায় যেতে যেতে যদি অন্য গ্রামের লোকদের দাঙ্গার কথা জানায়, তবে আইন অনুসারে তারাও থানায় যেতে বাধ্য! সুতরাং কোথাও একটা দাঙ্গা হবার উপক্রম হলে, গ্রামকে গ্রাম, ছেলে মেয়ে আদি ক'রে সকলকেই থানায় ছুট্‌তে হ'বে তো? কাজেই গ্রাম শূন্য হ'লে চোরের উপদ্রব বাড়বে। আর যদি তারা থানায় খবর দিতে না যায়, তবে তাদের তোমরা জেলে দিবে। তাই বলছি—জেল বাড়ান দরকার হবে!"

"তখন কর্ত্তাদের মুখ সাদা হয়ে গেল। আর আইনের দশা হ'ল কি? সে আইনের একটী মোকর্দ্দমাও আজ পর্য্যন্ত হলো না। কর্ত্তাদের এত সাধের আইনটা মাঠে মারা গেল! দুঃখের কথা রমেশ দত্ত পর্য্যন্ত লোকের কাছে বলেছিলেন যে,—'রাসবিহারী বাবু অমন আইনটা পাশ করার বিরোধী হয়েছিলেন কেন?' তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে আমি তাঁকে আইনের দোষ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।"

'সম্মতি আইনের' বিল লইয়া বাঙ্গালা দেশে যখন হুলস্থূল পড়িয়া যায়, দাদা সে বিলের সমর্থন করায় অনেকে তাঁহাকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়া বলিয়াছিল যে—"ওর ওতে কি? ছেলে মেয়ে নিয়ে ওকে ত সংসার কর্‌তে হয় না! খৃষ্টানের মত আচার বিচার, খৃষ্টানের পক্ষ নিয়ে তাই বিল সমর্থন করেছে!"

দাদা তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমাকে যে হিন্দুরা গালাগালি দিচ্ছে, তাদের চেয়ে হিন্দুয়ানিতে আমি অনেক ভাল। খৃষ্টানের আচার বিচার আমার কিছুই নাই, লোকে তা হয় তো জানে না। কিন্তু তোমরা ত দেখ্‌ছ? আমি বিল সমর্থন করেছিলাম বাঙ্গালীর সধর্ম্মীয় মান রাখতে! এগার বৎসরের মেয়ের সঙ্গে সহবাস না করলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, জাত যায়,—এই বিল সম্পর্কে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের লোকেরা যখন এ কথা শুনবে, তখন তারা আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা করবে? এরা বন্য জন্তু হ'তেও অসভ্য, বিবেকবুদ্ধিহীন—এই তো? সাহেবরা এ বিল নিয়ে যখন আমাদের সঙ্গে কথা কয়, তখন লজ্জায় যেন আমার মাথা খসে পড়ে।"

"বিলটা হিন্দু-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ প্রমাণ করতে যে শাস্ত্রের নজীর দেখান হচ্ছে, সে সব মিথ্যা! আর যদি তা সত্য হয়, আমি সে শাস্ত্র মেনে হিন্দু থাকতে চাই না! তাতে আমাকে যার যা বলে গাল দিতে ইচ্ছে হয় দিক্। আমাদের সমাজের কেউ একটু কিছু সংস্কার করতে গেলেই, না বুঝেসুজেই অমনি সব হৈ-চৈ করে

উঠ্‌বে। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়—এঁদের এ জন্য কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করতে হয়েছিল! কিন্তু এখন যদি গবর্ণমেণ্ট্ সতীদাহ আইন উঠিয়ে দিয়ে বলে—'হিন্দুর সতীদাহ প্রথা চলুক।' তা হ'লে কি হয়? হিন্দু বাবুরা সতীদাহ প্রথা আর চালায় কি?"

লবণ-শুল্ক রহিত করিবার জন্য মহামতি গোখলে ব্যবস্থাপক সভায় প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্বেও গবর্ণমেণ্ট লবণের শুল্ক রহিত না করিয়া উহা কিঞ্চিৎ মাত্র হ্রাস করিয়াছিলেন। সে কারণ দাদা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯০৭—১৯০৮ সালের তাঁহার বাজেট্ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—In lightening the salt-tax, the Government have lightened, in some small measure, the hard destiny of the toiling masses who constitute the real people and who ought to be their first care. The successive reductions of the duty have all been steps in the right direction. But the greatest still remains behind,—the total repeal of a tax which is such a heavy burden on those who are the least able to sustain it.

* * * The remarkable stimulus imparted to the consumption of one of the first necessaries of life by the recent reductions in the salt-tax of which the Finance Minister spoke on Wednesday last is to my mind a conclusive argument against the retention of an impost which falls so heavily on the hunger stricken masses. Speaking in 1303 my Hon'ble friend Mr. Gokhale said

that the consumption of salt was not even ten pounds per head, whereas the highest medical opinion lays down twenty pounds per head as the standard for healthful existence. But this standard will not be *reached, till the tax is completely wiped out ; though it may be said that where food is not* over-abundant, the consumption of salt need not be so high as twenty pounds. The Hon'ble Finance Member observed in defence, I presume, of the retention of the tax on salt that it is the only contribution towards the public expenditure that is made by a large number of the people. My Hon'ble friend Mr. Gokhale, I know, does not admit the correctness of this statement. I hope, however, Mr. Gokhale is right ; for, if the Hon'ble Finance Member's assertion is well-founded, what does it show ? It only shows the hopeless, the unspeakable poverty of the masses in India.

অনশনক্লিষ্ট ভারতবাসীকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,…… ……But the real problem before the Government is not to meet a famine by doles, but to avert it. This can only be done by lightening the burden of taxation, by the construction of irrigation canals, the spread of

improved methods of agriculture, the encouragement of manufacturing industries and the growth of intelligence among the people by means of education. Without these neither Agriculturists' Relief Acts nor Land *Alienation Acts will avert those terrible visitations which many intelligent foreigners regard as a standing reproach* to the Government of the country. The evolution of the famine code may be a very excellent thing, but the evolution of agriculture and manufacturing industry would be more welcome. A hungry people, My Lord, can never be a very contented people, for hunger is a mischievous counsellor, more mischievous than the most pestilent agitator or the most vocal loyalist whom it requires Ithurial's spear to unmask.

প্রজার নিকট হইতে গৃহীত কর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সৈন্য পোষণে ও সামরিক কার্য্যে অপরিমিত ভাবে ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রজার প্রদত্ত কর প্রজারই হিতার্থে ব্যয় করা রাজার প্রকৃত কর্ত্তব্য। সেজন্য তিনি রঘুবংশ হইতে শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন......

One of our poets who lived many centuries before Shakespeare and Milton and whose name is quite familiar in Germany if not in England has said of an ancient Hindu King :—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।

"For the welfare of the subjects themselves he used to take taxes from them ; just as the sun takes water (from the earth) to return (the same) thousandfold (in the shape of rain)."

Peace and order are no doubt the greatest blessings which the King confers on his subjects in return for the taxes paid by them, and it would be puerile to complain of any expenditure reasonably incurred in defending the country and in maintaining peace and order, without which no progress is possible. But there is a very *general idea in this country that the military estimates are excessive. In the time of the Mogul Emperors when* the soldiers were paid in land, only a few estates, or rather their revenues—which, I may mention in passing, never left the country—were set apart for the support of the army. At the present day, however, our military expenditure exceeds the whole of the land revenues, so that not only has all India become one vast military feud, but even the poor man's salt must contribute to the maintenance of mountain batteries ready to take the field in any part of the world.

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই বাজেট্ বক্তৃতায় তিনি অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর পক্ষ হইয়া করুণ-রসোদ্দীপক ভাষায় বলিয়াছিলেন...What the country wants is a network of schools for primary as well as secondary eduction, and above all the very highest kind of education ; for the industrial development of the country with its vast resources, is the problem of problems of the present day. We know how difficult it is to build up an industry without protection. But to ask for protection for our nascent industries would be to cry for the moon. We can not regulate our tariffs ; we can only suggest and implore. And this is the real secret of the strength of the Swadesi movement. But we know that the *industrial supremacy of England* was first established under a policy of strict protection which had such a disastrous effect on our own industries. We know, too, how Germany and the United States have prospered under a similar policy. The Government of India have, I am glad to say, expressed their sympathy with the Swadeshi movement. Now, if they can not show their sympathy by abolishing the excise duties on our cotton manufactures, let them show it by endowing a central polytechnic college on the model, I will not say of the institutions which have been established in the United

States or in European countries, but on those which have been established in Japan. But though we want more than Government are now in a position to give us, I repeat that we are deeply thankful for the liberal provision which has been made for the wider diffusion of education. And here let me congratulate the hon'ble Finance Minister on the Budget he has been able to lay before us. If it is true that 'a sorrow's crown of sorrows' is remembering happier things, it is equally true that a joy's crown of joys is the memory of unhappier times. And I remember the dark days when, owing to the financial situation of the Government, the construction of important public works had to be suspended, when all branches of the administration were starved, and when even the cry of the military authorities, 'Give, give,' not unfrequently meet with a blunt refusal.

ইংরাজী ১৯০৭ সালের ১লা নভেম্বর সিমলায় ব্যবস্থাপক সভায় 'রাজবিদ্রোহী সভা আইন' প্রবর্ত্তিত হইবার কালে দাদা উহার প্রতিবাদ করিয়া মুক্তকণ্ঠে তীব্র ভাবে বলিয়াছিলেন···

'My Lord, I am not using a mere phrase of course when I say that I was never oppressed by a sense of responsibility so deep or so solemn as on the present occasion. I am well aware that one of the first duties

of the States is to preserve law and order, and if I thought that either law or order was menaced or that public tranquillity could not be maintained unless the Government were armed with the power which they now propose to take, I would be the first to vote in favour of the Bill, and to vote for it with all my heart. But we have been assured on the highest authority that the present situation is not at all dangerous, and that the heart of of India is quite sound.

* * I repeat that the situation is not in the least dangerous and an overreadiness to scent danger is not one of the notes of true statesmanship. But suppose I am wrong and the position is really critical, what does it prove ? It proves, unless we are afflicted, not merely with a double or even a triple, but with a quadruple dose of original sin, that the Government of the country is not the most perfect system of administration that some people imagine.

* My Lord, I began by saying that this Bill is an indictment of the whole nation. If however, it is true, and this can be the only justification for the measure, that India is growing more and more disloyal, this Bill is really an indictment of the Administration. The

position must then be reversed. The Government, and not the people, must then be put on their defence. There is no escape from this dilemma. If there is no general disaffection, you do not want this drastic measure. The prairie cannot be set on fire in the absence of inflammable materials to feed it. If, on the other hand, a spirit of disloyalty is really abroad, it must be based on some substantial grievance which will not be redressed by coercion Acts. You may stifle the complaints of the people, but beware of that sullen and ominous silence which is not peace, but the reverse of peace. Even immunity from public seditious meetings may be purchased too dearly.

"It is said that we are intoxicated with the new wine of freedom, that Locke and Milton, Fox and Burke, Bright and Macaulay have unsettled our minds. But those who say so, take no account of the Time Spirit against which even the Olympian gods must fight in vain. I trust I am no dreamer of dreams; but I see that what is passing before us is a social and political evolution. You may guide it, but you can not arrest it, any more than you can make today like yesterday. Silent and as yet half conscious forces are at work, which

a wise statesman will harness to law and order by timely concessions. But a reactionary policy will only make the last State of the country worse than the first; for angry passions, which under milder measures would have died away, will stiffen into deep and lasting hatred, and the infection is sure to spread with time.

* It has been said that this Bill is a measure of great potency. I agree—but potency for what purpose? For putting down sedition? I say, no. It will be potent for one purpose and one purpose only, the purpose of propagating the bacillus of secret sedition. The short title of the Bill I find is—a Bill for the Prevention of Seditious Meetings, but I venture to think the title requires a slight addition. It ought to be amended by the addition of the words 'and the Promotion of Secret Sedition.' Order may be kept, peace may reign in India; but this measure will produce the greatest disappointment among those by whom, though they may not be the natural leaders of the people, public opinion is created and controlled.

সপ্তম অধ্যায়

আবাল্য দাদার দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী ছিল। বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত, হাইকোর্ট বন্ধ হইলেই তিনি কোথাও না কোথাও বেড়াইতে যাইতেন। পূজার দীর্ঘাবকাশের সময় তিনি দূরদেশে ভ্রমণে যাত্রা করিতেন। ভারতের এমন প্রসিদ্ধ স্থান নাই বলিলেই হ . যেথানে তিনি না গিয়াছিলেন।

১৮৯৪ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স দেশের বিখ্যাত সহর ও ঐতিহাসিক স্থান সকল পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক উক্ত বৎসরেরই নভেম্বর মাসের শেষাশেষি তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাড়ীতে আসিয়া জুতা পোষাক খুলিয়াই আমাদের ডাকিয়া বলিলেন—"মুনিবদের দেশ দেখে এলাম রে! মুনিবদের দেশ দেখে এলাম! যেন একটা নূতন জগৎ! নূতন সৃষ্টি! স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোকের কাণ্ডই আলাদা!"

এই বলিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—"হায় রে, আমার দেশ! হায় রে, আমার ভারতবর্ষ!...মাগো! তোমারই ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী ইংল্যাণ্ড আজ যেন রাজরাজেশ্বরীর মত বুক ফুলিয়ে শির উচ্চ করে জগতের মাঝে বিরাজ করছে। আর তুমি...? হতভাগ্য আমরা! আমাদের জন্যই তো তোমার এ দুর্গতি! বে অফ্ বেঙ্গল এসে এ জাতকে, এ দেশকে পৃথিবী
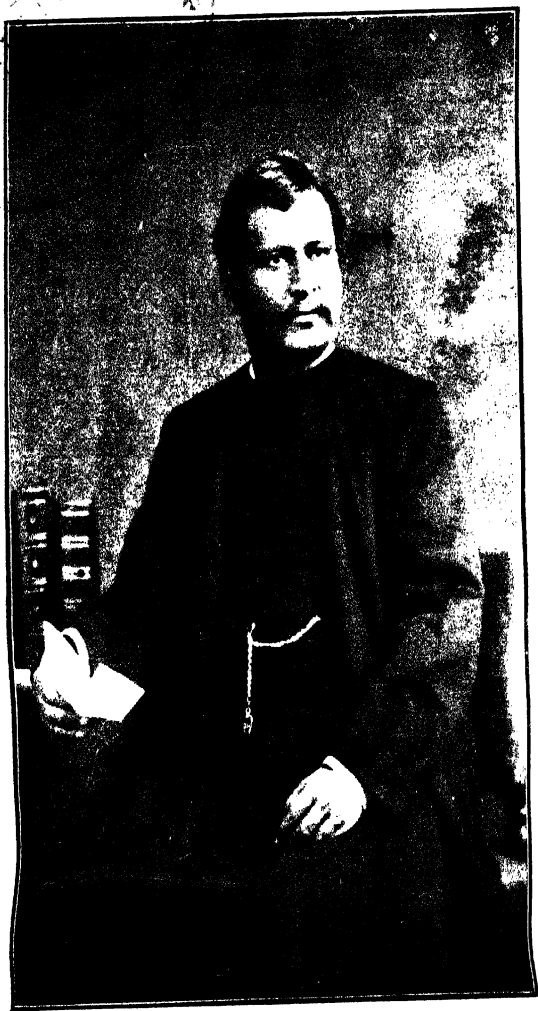
থেকে একেবারে ধুইয়ে, পুঁছিয়ে নিয়ে যাক! আমাদের জগতে বেঁচে থাকবার কোনও দরকার নাই! কোনও দরকার নাই! বেঁচে কি করছি? শুয়ার পেটে গিলছি, আর ইংরাজদের লাথি জুতা খেয়ে, তাদের সুখ-ঐশ্বর্য্যের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি! ইয়োরোপের লোকের স্বাধীন প্রাণের স্ফূর্ত্তি দেখে দেশের কথা ভেবে দুই একবার কেঁদে ফেলেছি। আর্ট গ্যালারীতে—ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংরাজের জয়, ট্রাফালগারে ইংরাজের জয়—এই সব ছবি দেখে মায়ের কোলের ছেলেগুলো পর্য্যন্ত হাত তুলে লাফাচ্ছে। হায় রে! এরা বড় হয়ে পৃথিবী শাসন করবে না তো করবে আর কারা?

"প্যারিসএর হোটেলে একজন লোক আমায় এক দিন বললে—'তোমরা তো দেখি খুবই বুদ্ধিমান, দীর্ঘকায়, হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ; তবুও তোমরা অত কোটী লোক এত দিন ধরে ইংরাজের অধীনতা স্বীকার ক'রছ যে কি করে, এ আমরা কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারি না!' আমি আর উত্তরে কি বল্‌বো? কপালে হাত দিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম। মোটের উপর আমি ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স বেড়িয়ে কোনও সুখ পাই নাই। এই সব দেখে শুনে প্রাণে কষ্টটাই বেশী হয়েছিল।

তবে ফরাসীদের আমি চিরদিন বড় শ্রদ্ধা করি। তাঁদের অন্য গুণের জন্য ততটা নয়,—তাঁরা মাকে বড় ভালবাসেন, ভক্তি করেন, সেইজন্যই—তাই তাঁদের দেশটা দেখবার সময় মনটায় একটু সুখ হতো।"

ইংল্যাণ্ড হইতে আসিয়া এক দিন জজ্ নরীসের সহিত দাদার সাক্ষাৎ হওয়ায়, এ কথা সে কথার পর, নরীস্ সাহেব বিলাতের কথা পাড়িয়া বলিলেন—"দেখলে, কেমন দেশ? সকলে কিরূপ কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত, একদণ্ডও যেন বিশ্রামের সময় নাই। কলের ইঞ্জিনের মত কাজ করছে! সকলের প্রাণে কেমন উৎসাহ! আর এ দেশের লোক কুঁড়েমি করে দিন কাটাতে পারলে, নড়ে বসতে চায় না! কোনও রকমে উদর পূর্ত্তি হলেই নিশ্চিন্ত। ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি নাই, নিজের উন্নতির দিকে চেষ্টা নাই। যেরূপে হউক দিনটা অতিবাহিত হলেই—ব্যস। একটা মাটীর ঠাকুর গড়ে তার পূজা উপলক্ষে বৎসরে সহস্র সহস্র টাকা অপব্যয় করে ফেলে। এতে আর এ দেশের লোকের উন্নতি হবে কিসে?"

উত্তরে দাদা নরীস সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দেশের লোকের কথা যাহা তিনি বলিলেন, তাহা ঠিক্। কিন্তু কিসে টাকা হবে, কিসে ঐশ্বর্য্য মান-সম্ভ্রম বাড়বে; আজ এ-দেশের কাল ও-দেশের লোকের সহিত কাটাকাটি মারামারি করা, ইহার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিনরাত্রি ছুটাছুটী করিলেই মনুষ্য-জীবনের কি সার্থকতা হইল? এ হেন জীবনে প্রকৃত সুখ-শান্তি কোথায়? এ দেশের লোকের ধারণা—জীবনটা তো ক্ষণস্থায়ী, সেটা যে কয়দিন থাকে, সুখ শান্তিতে কাটিয়া যাইলেই হইল। তাহার জন্য এত উদ্বেগ ভোগ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের দেশের লোকের শিক্ষা, যখন,—'যম কেশে ধরিয়া আছে, ভাবিয়া ধর্ম্ম ও অমর ভাবিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে।' তখন এ দেশের লোকের

জীবনযাত্রার সহিত তাঁহাদের দেশের লোকের জীবনযাত্রার তুলনা হতেই পারে না।

আর পুতুল গড়িয়া পূজা করিয়া যে হাজার হাজার টাকা খরচ করিবার কথা,—পুতুল একটা গড়িতে দশ কুড়ি টাকা মাত্র খরচ পড়ে। টাকা খরচ হয়, দীন দুঃখীদের খাওয়াইতে। বৎসরে একবার দীন দুঃখীদের খাওয়াইতে, উলঙ্গ ও চীরবসনধারীদের একখানা করিয়া নূতন কাপড় দিতে যে টাকা ব্যয় হয়, তদপেক্ষা অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা আর কি আছে? নরীসের উক্তির প্রতিবাদ কল্পে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, উহার সকলগুলিই তাঁহার অন্তরের কথা নয়। স্বদেশবাসীর উদ্যমহীনতা, কর্ম্ম-শৈথিল্য ও আলস্যপরায়ণতার নিমিত্ত তিনি শতমুখে তাহাদের নিন্দাবাদ করিতেন বটে, কিন্তু পরমুখে নিজজনের কুৎসা সহ্য করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। সে ধাতুতে ভগবান তাঁহার প্রকৃতি গঠন করেন নাই। তাই তিনি বলিয়াছিলেন……

…"আমি নরীস্‌কে যে এ রকম কথা বলেছিলাম, তার সবই যে আমার প্রকৃত মনোগত ভাব, তা নয়। নরীস্ খুব আস্ফালন ক'রে আমাদের নিন্দা আর নিজের দেশের লোকের তত গুণ গাইলেন বলে, তাঁকে জব্দ করবার জন্যেই ওসব কথা বলেছিলাম। তা না হলে, মানুষ আজীবন যথাসাধ্য পরিশ্রম করবে বই কি! সুস্থ, সমর্থ হয়ে যে খেয়ে পরে কেবল কুড়েমি করে দিন কাটায়, সে জগতের মানব-সমাজে একটা পাপ! এই আমার দৃঢ় ধারণা।"

১৮৯৫ সালে পূজার ছুটীতে দাদা কাশ্মীর-ভ্রমণে যান।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিয়া তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। একদিন ঝিলামে নৌকা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে চারিদিকের দৃশ্য দেখিয়া আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভৃত্য রামনারায়ণকে আহ্বানপূর্ব্বক দাদা বলিলেন—"কেমন রামনারাণ! কেমন সুন্দর সব দেখছ? বেশ ভাল লাগছে তো?"

আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত, মুখমণ্ডল মাত্র বাহির করিয়া শীতের প্রভাবে জড়সড় হইয়া চিবাইয়া চিবাইয়া নাকী সুরে রামনারায়ণ উত্তর করিল—"হুজুর! ই আর কি! জাড়কালে কল্‌কাতার গাঙ্গে নৌকায় ক'রে বেড়ালেই তো হতো। এত কষ্ট করে এত দূরে এসে হায়রান হবার কি কাজ ছিল?"

এই গল্পটী করিয়া দাদা বলিতেন—"মানুষের প্রকৃতি বোঝ। যে সৌন্দর্য্য একজনকে আত্মহারা করে, তাহাই আবার অন্যের কষ্টদায়ক হয়! এ পার্থক্যের হেতু, শিক্ষা! রামনারাণের যেরূপ শিক্ষা, তাতে সে ওরূপ বলাতে আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই। অশিক্ষা মানুষকে কত সুখ সম্ভোগ হতে যে বঞ্চিত করে, তার ইয়ত্তা নাই। এ হিসাবে ইয়োরোপীয়েরা আমাদের হ'তে অনেক অগ্রসর। ওরা জীবনটা যত রকম সুখ স্বচ্ছন্দে উপভোগ করতে জানে, আমরা ততটা জানি না।"

"স্বাধীনতা মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ, আরাম। সেটা ইয়োরোপের লোকেরা যেমন বোঝে, আমরা তা কি বুঝি,—না সেটা ভোগ করবার আমাদের অন্তরে তেমন স্পৃহা আছে?

যদি সকলের প্রকৃত সে ভাব থাক্‌তো, তা হ'লে আমরা এমন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে কখনই থাক্‌তে পারতাম না। ইয়োরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশও স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে কেমন আজীবন যুঝে! 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং',—এটা এখন আমাদের কাছে একটা কথার কথা, মাত্র।"

ইয়োরোপীয়েরা কাশ্মীরের, 'ভেনিশ অফ দি ইষ্ট' আখ্যা দিয়াছেন। সে কারণ কাশ্মীর দেখিয়া, ভেনিস দেখিবার জন্য দাদার প্রবল বাসনা হয়। তিনি আর কালবিলম্ব করিতে পারিলেন না। পর বৎসর পূজাবকাশে হাইকোর্ট বন্ধ হইলেই তিনি ইটালি যাত্রা করেন। এ যাত্রায় আমাকেও তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে গিয়া জাহাজে চড়িলাম। যথা সময়ে বৃন্দিসিতে গিয়া পৌছিলাম। বৃন্দিসি একটা পল্লীগ্রামেরই মত। সেখানে তিন চারি দিন থাকিয়া দাদা তথাকার কৃষকদের সাদা-সিদা জীবনযাত্রার ও সরল প্রাণের পরিচয় পাইয়া তাহাদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়া বড় সুখ পাইতেন। তাহাদের ব্যবহারে দাদা বলিতেন—"দেখ, এঁরা, কি ভদ্র! যেন আমাদেরই নিজের দেশের চাষারা আমাদের যত্ন ক'র্‌ছে।"

বৃন্দিসি হইতে দাদা জাহাজে ভেনিস্‌ যান। কাশ্মীর দর্শনের পর ভেনিস্‌ দেখিয়া যে সুখলাভের আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, এখন ভেনিস্‌ দেখিয়া তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমায় তিনি বলিলেন—"মানুষের সৃষ্টি আর ভগবানের

স্বষ্টিতে অনেক তফাৎ তো রে? কাশ্মীর দেখছি এক, আর ভেনিস্ দেখছি এক! এর জলের উপর বড় বড় বাড়ী, গির্জ্জা; আর কাশ্মীরে ঝিলামের উপর ফুটন্ত পদ্ম ফুলের বন। চারিধার বরফে ঢাকা; পাহাড়ের চূড়া সূর্য্যকিরণে ঝল্মল্ করছে। আর পাহাড়ের গা নানা রকম ফুলে একেবারে ছেয়ে আছে! ফল ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরপুর! আমার মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কাশ্মীর ভেনিস্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

বাইরণের আবাসগৃহ, রাওল্ট ব্রীজ, ব্রীজ অফ্ সাই, ডজের রাজপ্রাসাদ এবং চিত্র-গৃহ প্রভৃতি দেখিয়া ভেনিস্ ছাড়িবার কালে দাদা বলিলেন—"বইএ ভেনিসের বর্ণনা যাহা পড়া গেছে, এখন তার আর কিছুই নাই। রামহীন অযোধ্যারই মত এখন এর দশা!" জেনোয়া হ'য়ে পিশায় গিয়া সেখানকার গির্জ্জায়, যে ঝাড়ের দোলন দেখিয়া গ্যালিলিও ঘড়ির পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করেন, সেই ঝাড়টাকে দাদা ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া সামান্য দোলাইয়া দিয়া বলিলেন—"এমনি একটু ঝাড়টার দোলন দেখে গ্যালিলিওর মাথা খেল্‌লো, আর ঘড়ির পেণ্ডুলাম আবিষ্কার হ'লো। আর আমাদের, 'হ'রের ধন শ্যামা পাবে, না শ্যামার ধন হ'রে পাবে', এই নিয়ে মাথা খেল্‌ছে আর কামড়া-কামড়ি করে মরছি। দূর…! দূর…!"

তার পর পিশায় গ্যালিলিওর বাস-ভবন দেখে দাদা বল্‌লেন—"দেখ্! গ্যালিলিওর বাড়ী—কলিকাতার অনেক আস্তাবলও এর চেয়ে ঢের ভাল। কিন্তু ইচ্ছা হচ্ছে এর উঠানের গুচ্ছের ধূলো নিয়ে

মাথায় ঘষে এইখানে একবার গড়া-গড়ি দি! এই সব জায়গাই মানুষের প্রকৃত তীর্থক্ষেত্র!”

ফ্লোরেণস্ হ’তে মিলান্ যাইবার পথে রেলে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দুই একটা কথা হওয়ার পর ভদ্রলোকটী বলিলেন—“তোমরা ইংরাজকে কেমন পছন্দ কর?” দাদা উত্তর দিলেন—“তোমরা অষ্ট্রিয়ান্‌দিগকে কেমন পছন্দ ক’রতে?” তখন ভদ্রলোকটী একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন—“তা’ত ঠিক কথা, বিদেশীর পীড়ন সকলের কাছেই সমান। আমরা তো অনেক কর্ম্মভোগের পর মুক্ত হয়েছি। তোমরাও মুক্ত হ’বেই হবে! বুদ্ধিমান জাতি জগতে কখনও পরাধীন থাকতে পারে না। একটা জাতি অধিক ক্ষমতাশালী হ’লে প্রায়ই তারা অত্যাচারী হ’য়ে পড়ে। তাতেই শেষে তাদের পতন হয়! রোমই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ!”

মিলানে আমাদের (গাইড) পরিদর্শক এক দিন রাস্তায় একটা গ্যারিবল্‌ডীর ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার কীর্ত্তি কলাপ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। হস্তপদ আস্ফালন করিয়া গ্যারিবল্‌ডীর বিষয় বিবৃত করিতে সে যেন শতমুখ হইল। আমি তাকে বল্‌লাম—“আমরা গ্যারিবল্‌ডীর সম্বন্ধে সব জানি,—ও আপনাকে আর শুনাইতে হইবে না।” কিন্তু পরিদর্শক নিবৃত্ত হইল না। সমানেই বলিতে লাগিল।

দাদা বলিলেন—ওঁকে বারণ ক’র না। বল্‌তে দাও না। দেখছ না, আমরা বিদেশী ব’লে নিজের দেশ উদ্ধার-কর্ত্তার কথা আমাদের শুনাতে ওঁর কত আগ্রহ! এতে ওঁর যে কি আনন্দ

হচ্ছে, তা আমি বেশ বুঝছি। ও আনন্দটা ওঁকে ভোগ ক'রতে দাও।"

"আমাদের দেশে গ্যারিবল্‌ডি কবে জন্মাবে রে? সেদিন কি দেখে মরতে পারব? তার আভাস দেখে মরতে পারলেও হয়। ইটালি ঘুমুচ্ছিল যেন সজাগ হয়ে, ভারত ঘুমচ্ছে যেন বিঘোরে! এ ঘুম যেন তার আর ভাঙবে না! 'আরও কত কাল পরে বল ভারত রে' গানটা জান? যিনি এ গান বেঁধেছেন, তাঁরই মুখে আমি এ গান শুনেছিলাম,—জ্যোৎস্না-রাতে যমুনার উপর তাজের চাতালে শুয়ে। লোকটার শুধু কবিত্বশক্তি আছে নয়, হৃদয়ও আছে! গান করবার সময় তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। আমারও চোখ ভিজে গিয়েছিল। দেশাত্মবোধ আমাদের আছে, কিন্তু বড় ভাসা-ভাসা। কে সেটা প্রগাঢ় করে জাগিয়ে তুলবে!"

তার পর একটা চৌরাস্তার মধ্যস্থলে সুউচ্চ প্রকাণ্ড এক বেদীর উপর একটা বালকের প্রস্তর-মূর্ত্তি। তাহার তলদেশে দাঁড়াইয়া বহু-সংখ্যক বালক-বালিকা লাফালাফি করিতেছে। গাইড আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া বলিল—"এই প্রস্তর-মূর্ত্তিটা একটী রুটীওয়ালার ছেলের। মিলানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে উহাকে স্থাপন করা হয়েছে। অষ্ট্রীয়ান সৈন্য যখন মিলানে প্রবেশ করিতেছিল, তখন সহরবাসীরা, সৈন্যগণ সকলেই প্রাণ ভয়ে পলাইতে লাগিল। এই এগার বৎসরের রুটীওয়ালার ছেলে তাহা লক্ষ্য করিয়া, একটী কুঠার মাত্র লইয়া একা অষ্ট্রীয়ান সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অষ্ট্রীয়ানদের হাতে বালক প্রাণ দিল। কিন্তু

সপ্তম অধ্যায়

ইটালীয়ানরা এ ঘটনায় লজ্জায় আর পলাইতে পারিল না। ফিরিয়া বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করিল। প্রায় প্রত্যেক মিলানবাসীই তাদের শিশু সন্তানদের মাসের মধ্যে অন্ততঃ এক দিনও এই মূর্ত্তির নিকট পাঠাইয়া দেন।" এই কথা শুনিয়া দাদা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এখন বেশ বুঝলাম, প্রায় এক হাজার চারিশত বৎসর পরাধীন থেকেও ইটালী কেন আবার স্বাধীন হল। এমন ছেলের জন্ম যে দেশে হয়, সে দেশকে পরাধীনতায় রাখা বোধ হয় ভগবানেরও সাধ্যাতীত! বাহাদুর ছেলে! ধন্য ছেলে!"……বলিয়া, বদ্ধাঞ্জলি আপনার ললাটে স্পর্শ করাইয়া সেই মূর্ত্তিকে দাদা প্রণাম করিলেন। আমাকেও সেইরূপ করিতে আদেশ দিলেন।

পরে রোম, নেপ্‌লস্ দেখিয়া দেশাভিমুখে ফিরিলাম।

জাহাজে এক দিন একটা ইংরেজ স্ত্রীলোক রাত্রে টেবিলে আহার করিবার সময় ভারতবর্ষের নানা কুৎসা করিয়া শেষে বলিল—"ওখানে গ্রীষ্মে রাত্রে নিদ্রা হয় না,—পাখা টানা কুলি ভাল করে পাখা টানে না……চাকরদের সর্ব্বদা কাজ করতে ব'লেও কাজ করান যায় না,……ধোপাও সময় মত কাপড় দেয় না,…… এসবের জন্য ওদেশে জ্বালাতন হ'য়ে থাক্‌তে হয়।"

দাদা তখন তাকে বলিলেন,—"তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা বলছ, হয় তো তা যথার্থ; কিন্তু এসব থেকে পরিত্রাণ পাবার তো খুব সহজ উপায় আছে! তুমি তো ও দেশে না গেলেই পার? আর চাকর সম্বন্ধে যা বলছ, সে বোধ হয় ও দেশে গিয়ে তোমরা

বেশী চাকর-বাকর রাখ; নিজ দেশের মতন করে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করলে আর এ হাঙ্গামা তো পোয়াতে হয় না।"

পূর্ব্বে যে সব ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষ আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিত, ইহার পর হইতে তাহারা আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। দাদা আমায় বলিলেন—"হুজুররা আমাদের সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ করে দিল রে! তবে তো বড় ব'য়েই গেল! আর সাত আট দিন বইতো নয়। জাহাজ হ'তে নেমে গেলেই সম্বন্ধ ফুরাল।"

যথা সময়ে বোম্বে আসিয়া জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দাদা বলিলেন—"এই তো আপনার দেশে ফিরলাম। এখন বাড়ীতে গিয়ে আবার হাঁড়ী ভাঙ্গা যাগ-গে। বিপিন দত্ত আমার কাছে এলেই বল্‌তো—'কি গো! কেমন হাঁড়ী ভাঙ্‌ছ?' হাঁড়ী ভাঙ্গার গল্প জান না?—"ত্রিবেণীর শ্মশানে একটা ক্ষেপা লাঠি নিয়ে সমস্ত দিন-রাত মড়ার হাঁড়ী ভেঙ্গে বেড়াত। যখন অত্যন্ত কষ্ট হতো তখন মাটীতে বসে পড়ে বলত'......'বাপরে! আর তো হাঁড়ী ভাঙ্‌তে পারি না। হে ভগবান! আমায় বাঁচাও।' ক্ষেপাকে কেই বা হাঁড়ী ভাঙ্‌তে বলেছিল, কেনই বা তার হাঁড়ী ভাঙ্গা! আমাদেরও সেই ক্ষেপার মতই হাঁড়ী ভাঙা হচ্ছে আর কি!"

এই ইটালী ভ্রমণ করিয়া আসিবার পর হইতেই দাদা আর দূরদেশ ভ্রমণে যাইতেন না। পূজার অবকাশটা দার্জ্জিলিং কিংবা সিমলা শৈলে কাটাইতেন।

সিমলায় বাসের জন্য দাদা 'সামার হিলে' একটী সুন্দর বাড়ী

ক্রয় করিয়াছিলেন। অন্যান্য অল্পাবকাশে তিনি পুরী যাইতেন। সমুদ্র-স্নানে তাঁহার বড়ই আনন্দ ছিল। দাদা বলিতেন—"হেমবাবু আমাকে কেবলই বলেন যে—'আপনি এত দেশ ঘুরলেন, একবার গ্রীশটা দেখে আসুন। সভ্য, শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রীশটা একবার দেখা উচিত। আমার তো আর উপায় নাই, তাই আপনাকে বলছি। গ্রীশটা না দেখে এলে আপনার দেশ-ভ্রমণের পুণ্যটা অসমাপ্ত থেকে যাবে।' আমার তো খুবই ইচ্ছা ছিল গ্রীশ্‌টা দেখবার,......' Where burning Saffo loved and sung ; Where Delious rose and Fobous sprung ! সক্রেটিস্‌এর জন্ম স্থান। শিক্ষিত সভ্য লোকেদের এদেশটা একবার দেখা উচিত। হেমবাবু ঠিক বলেছেন! তিনি শিক্ষিত লোক, তাই তাঁর প্রাণে ও ইচ্ছাটা জাগে! কিন্তু দেখ, আমার এখন বয়স হয়েছে, আর এই বাতের জন্যও দূরদেশে যেতে ভয় হয়। শেষে কি তোমাদের ছেড়ে বিদেশে বিভূমে গিয়ে মরবো ? বাঙ্গালীরা তো বলে, পঞ্চাশ পেরুলে যে কয়েকদিন বাঁচা যায়, সেটা ফাউ। তাহলে আমার তো ফাউ চলতে আরম্ভ হয়েছে। তা, ফাউ আর কতই বা পাব ?"

দাদা নিজের বিপুল ব্যবসায় ও কাউন্‌সিলের কার্য্যে অহর্নিশি ব্যস্ত থাকার কারণ তাঁহার আইন পুস্তকের নূতন সংস্করণ বহুকাল অবধি বাহির করিতে পারেন নাই। এই হেতু উক্ত পুস্তক বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পাঠার্থীদের উহা পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় তাঁহারা বাজারে উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে

না পাইয়া দাদাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া পুস্তক বাহির করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

দাদা তখন পুস্তক বাহির করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া বলিলেন—"যখন বইটার জন্যে লোককে অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে, তখন আমার হয় বইটা প্রকাশ করা, নয় ওটা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।"

তাহার পর হইতে তিনি অধ্যয়নের সময় সংক্ষেপ করিয়া পুস্তকের নূতন সংস্করণে মনোনিবেশ করিলেন। দুই বৎসর পরিশ্রমের পর ১৯০২ সালে বর্দ্ধিত-কলেবরে পুনর্লিখিত ভাবে পুস্তক প্রকাশিত হইল। সংবাদপত্র, ও আইন ব্যবসায়ী মাত্রেই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এক দিন হাইকোর্টে মিঃ টি, পালিত দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন—"আমি তোমার বই বেরোতেই কিনে এনে পড়েছি। আইন পড়বার জন্য নয়; সাহিত্য পড়বার ইচ্ছায়। নীরস আইনের বই তুমি এমন সরস করে লিখেছ যে তার তুলনা নাই। আমি দৃঢ়-কণ্ঠে বল্‌ছি,—এর অপেক্ষা ভাল আইনের বই পৃথিবীতে আর নাই!"

এই কথা শুনিয়া দাদা বলিয়াছিলেন…"আমার বই সম্বন্ধে পালিতের এ রকম সমালোচনায় আমি একটু খুসী হয়েছি। কিন্তু এই বই লেখায় আমার এক বিপদ হয়েছে। মর্টগেজের মোকর্দ্দমায় অনেক সময় আমাকে আমার বইএর লেখার বিরুদ্ধে সওয়াল জবাব করতে হয়। আমি বইএ ভুল লিখেছি এই কথা জজদের

তখন বুঝাই। জজেরা তখন বড় ধাঁধায় পড়ে যান। শেষে কাছারীর ছুটী হ'লে, আমায় তাঁদের বসবার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন...'আপনার সওয়াল জবাব শুনে আমরা বড় গোলে পড়েছি। এই মোকর্দ্দমাটায় আপনি সওয়াল জবাবে যা বল্‌লেন সেটা ঠিক, না বইএ যা লিখেছেন সেটা ঠিক? আমরা এটা জানতে চাই। আপনি বলুন।' এ'তে আমি যে কি বিপদে পড়ি তা বুঝতেই পারছ! 'সওয়াল জবাব ঠিক' বল্‌লে, ভদ্রলোক যা জান্‌তে চাচ্ছেন তাতে মিছা কথা বলা হয়; আর 'বইয়ের লেখা ঠিক'...বল্‌লে, মক্কেলের ক্ষতি করা হয়। তবে বাধ্য হয়ে তখন তাদের যথার্থ কথা বলি যে বইএর লেখাটাই ঠিক। কিন্তু জজেদের এ রকম ক'রে জিজ্ঞাসা করা যে অন্যায়, সেটা তাঁদের বুঝা উচিত।"

উত্তরে বলিলেন…"যেমন আছি তেমনিই থাক্‌বো, তাতে যা হয় হবে!"

এই সময় অতি প্রত্যূষে এক দিন জজ্‌ চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে জ্বর অবস্থাতেও গৃহের মেঝেতে সামান্য একটা কম্বলে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতে দেখিয়া বলিলেন……"আপনার এ সব দেখে শুনে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। এ অনুষ্ঠান তো এক রকম উঠে যেতেই বসেছে। আপনার মত লোককে এ সব বিষয়ে এরূপ ভাবে হিন্দুয়ানা পালন ক'রতে দেখলে, কোন্ হিন্দুর প্রাণে না সুখ হয়? পিতার সহিত আপনার মাঝে মাঝে মনোমালিন্য হ'তো; লোকে তা নিয়ে বাড়ায়ে অনেক কথা ব'লতো। এখন আপনার এরূপ আচরণে লোকের সে সব ভুল ধারণা গেছে।"

শ্রাদ্ধের পাঁচ দিন পূর্ব্বে দাদার জ্বর মগ্ন হইল। তিনি তোড়কণায় গিয়া শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন তিনি বলিলেন…"দেখ, বাবার শ্রাদ্ধে এত টাকা খরচ করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। ভেবেছিলাম, শ্রাদ্ধটা সামান্য সাতআট হাজারে সেরে, তার পর বেশী টাকা খরচ ক'রে তাঁর নামে স্থায়ী একটা কিছু করে দেব। কিন্তু তাহ'লে কি রক্ষা ছিল! দেশের বামুন পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে, সকলেই গালাগালিতে আমার ভূত ভাগিয়ে দিত। ব'লতো,……'ও তো জানাই আছে; রাসবিহারী ঘোষ আবার বাপের শ্রাদ্ধ ক'রবে! ওর তো বাপের

সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্বন্ধ ছিল!' কিন্তু ভগবান জানেন, আমি বাবাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ক'রতাম কি না! তোমরাও তো তা জান? লোকের মন্দটাই সবাই গেয়ে বেড়ায়। বাবা আমার বদ্-রাগী ছিলেন, আমিও সেই বাপের ছেলে,—এই জন্য দুজনের মনের মিল হতো না;...এই যা!"

"আমার যদি ছেলে থাকতো, আর সে আমার মত বদ্-রাগী হলে, কি হ'তো? এক জায়গায় থাকলে হয় তো দুজনে খুনো-খুনি হ'তো। তোমাদের চাইতে ভগবান যেমন আমায় কতকটা বুদ্ধি বেশী দিয়েছেন, তেমনি বদমেজাজটাও তিনিই দিয়েছেন। কি ক'রব!...হাত নাই! তা বলে বাবার উপর আমার রাগ কখনও ছিল না। বাবা যদি আমার জন্য আর কিছুই না ক'রতেন—আমায় যে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন শুধু এর জন্যই আমি তাঁর কাছে চির-কৃতজ্ঞ! তাঁর প্রতি কিছুমাত্র বিদ্বেষ ভাব যদি আমার মনে থাকৃত, তা হ'লে ভগবান এ সুখ-সম্পদ আমাকে কিছুতেই দিতেন না। এ আমি নিশ্চয় ব'লছি!

"বাবা যেমন ইংরাজী জান্‌তেন, তখনকার কালে সে রকম ইংরাজী খুব কম লোকেই জান্‌ত। তার পরে বুদ্ধিই বা তেমন ক'টা লোকের থাকে? তাই একজন কমিশ্‌নার তাঁকে নয়শত টাকা মাহিনা দিয়া চিটাগঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য ধরেছিল। বাবা সে চাকরী নিতে অস্বীকার ক'রে তাঁকে বলেছিলেন......'আমি অত দূর-দেশে গেলে, আমার ছেলের লেখা-পড়ায় গোল হ'বে; আমি ও চাকরী নো'ব না।' বাবা একজন বেশী পয়সাওয়ালা

লোক ছিলেন না। অত টাকা মাহিনার চাকরী ছাড়া তখনকার দিনে তাঁর পক্ষে সহজ কাজ হয় নাই। এ রকম আরও কয়েকবার হয়েছিল। কেবল আমার পড়া-শুনার গোল্ হ'বে বলেই তিনি ও সকল চাকরী নেন্ নাই। আমি ছেলেবেলা হ'তে এখন পর্য্যন্ত তাঁর এই সব কথা প্রায়ই মনে করি। আমি কি কখনও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হ'তে পারি?"

পূর্ব্বে বৰ্দ্ধমানে শবদাহ করিবার ভাল স্থান ছিল না। বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় অত্যন্ত বৃষ্টি বাদলা হওয়ায়, দাহকারীদের বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য দাদা সেই শ্মশানক্ষেত্রে বহু অর্থব্যয় করিয়া পিতার নামে চিমনিওয়ালা শবদাহ স্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়

লর্ড কার্জ্জন, ১৯০৫ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় বক্তৃতায় এশিয়াবাসীর যে কুৎসা করিয়াছিলেন, কলিকাতায় টাউন-হলে তাহার প্রতিবাদ-সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া দাদাকে ধরিলেন।

দাদা বলিলেন······"যদি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রতিবাদ সভা করা হয়, এবং এখানকার সভায় অন্য আর কাহাকেও বক্তৃতা দিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি বক্তৃতা দিতে পারি।"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন······"সেইরূপ ব্যবস্থাই হইবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে টাউন-হলে বক্তৃতা দিয়া আসিয়া দাদা বলিলেন "লাঠি দিয়ে মারার এক রকম যাতনা, আর ছুঁচের খোঁচার আর এক রকম যাতনা! আমি বক্তৃতায় যা বলেছি, তাতে কার্জ্জন্ ছুঁচে বেঁধার যাতনা পাবে। দেখ না? কার্জ্জন্ আমাদের মিথ্যাবাদী···ইত্যাদি বলে! আর তাদের জাতির দৃষ্টান্ত দেখ। ক্লাইব যে এদেশটাকে চুরি করবার পথ দেখিয়েছে! যার মত চোর, জালিয়াৎ, ঘুঁসখোর, মিথ্যাবাদী লোক পৃথিবীর আর কোন জাতের মধ্যে জন্মে নাই;······জন্মাবেও না! কার্জ্জন তারই স্বজাতীয় হ'য়ে আবার এশিয়ার লোককে গাল দেয় কি ক'রে? ও যখন

ক্লাইবের খুব ভক্ত, ওর কাকেও গাল দেওয়া উচিত নয়। এ দেশবাসীর তো কথাই নাই!"

এই সময় লর্ড কার্জ্জনের সহিত কিচেনারের খুব মন-কষা-কষি চলিতেছিল বলিয়া, কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীও দাদার এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রশংসাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন।

বক্তৃতা দিবার পরদিন সন্ধ্যার সময় বাগ্মী ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ মহাশয় দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন......"কার্জ্জনের বক্তৃতার, সভা ক'রে প্রতিবাদ করা হবে শুনে ভেবেছিলাম...... 'এতে আর কি বলা যাবে—কতকগুলা কেবল গালাগালি দেওয়া ছাড়া।' কিন্তু তোমার বক্তৃতা শুনে বুঝলাম, কার্জ্জনের বক্তৃতার যথার্থ প্রতিবাদ করা হ'য়েছে। আজ কোর্টে লাইব্রেরীতে আমি তোমার বক্তৃতা সম্বন্ধে ব'লছিলাম যে......'ভারতবর্ষে তিন জন লোক আছে কি না সন্দেহ, যে এ রকম বক্তৃতা দিতে পারে!' তাতে অনেকে ব'লে উঠ্‌লো......'এ কথা আপনি কি ক'রে বলতে সাহস পান?' উত্তরে আমি বল্‌লাম......'তার দৃষ্টান্ত এই দেখ না! তোমরা তো সব শিক্ষিত লোক, তোমাদের মধ্যে কেউ এ রকম বক্তৃতা দিতে পার কি?"

পালিত সাহেব দাদাকে পত্র লিখিয়াছিলেন......"কার্জ্জনের বক্তৃতার প্রতিবাদ করবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তোমাকে যে ধরিয়াছিলেন, সে জন্য আমি তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দি! যে কার্য্যে যাহাকে আবশ্যক, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা

ঠিক বুঝিয়াছিলেন। কার্জ্জনের বক্তৃতার এরূপ ভাবে প্রতিবাদ করিতে তোমা ব্যতীত আর কেহই সমর্থ হইত না, এ আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।"

দাদার উপরি উক্ত বক্তৃতার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"The first thing that I have to say about myself is that I cannot claim to be a hero of a hundred platforms or even of one, nor am I an habitual reviler of authority. I am by profession a lawyer and not an agitator. And if I am here this afternoon, it is not because I take any delight in railing at Government, but because I honestly believe that Lord Curzon is lacking in the breadth of vision, tactfulness and flexibility of temper which we naturally expect in one occupying the unique position of an Indian Viceroy.

One of the greatest political figures in England said on a memorable occasion that he did not know how to frame an indictment against a whole nation ; but Lord Curzon dressed in the Chancellor's robe and a little brief authority was able to frame an indictment not only against the people of India, but also against all the various nations of Asia—Asia which gave to the world Goutama Buddha, Jesus Christ, and Muhammad, who

may not have taught men how to rule but who certainly taught them how to live and how to die.

I will now pass on to some of the legislative and administrative measures of His Lordship. Sir Alexander Mackenzie would have at least left us the shadow of self-government; to Lord Curzon belongs the credit of reducing it to the shadow of a shade. The Lieutenant Governor wanted to admonish us only with whips. But His Lordship chastised us with scorpions. The proposed Partition of Bengal is also another "unsuggested check." The abolition of the competitive test would also seem to be another "unsuggested" reform.

Lord Curzon is wiser than the members of the Public Service Commission, wiser than Mill, wiser than Macaulay, wiser than the distinguished statesman who accomplished a similar reform in the Civil Service in England. Lord Curzon, however, is anxious to "free the intellectual activities of the Indian people, keen and restless as they are, from the paralyzing clutch of examinations," for which every idle lad in this country ought, I think, to be grateful to him.

Lord Curzon's measure will place University education beyond the reach of many boys belonging to the

middle classes. And here, perhaps, I may be permitted to remark that to talk of the highest mental culture as the sole aim of University training betrays a singular misconception of the conditions of Indian life. Our students go to the universities in such large numbers, because they cannot enter any of the learned professions or even qualify themselves for service under Government. I would also point out that education, though it may not reach a very high standard, is still a desirable thing, on the principle that half a loaf is better than no bread. The Official Secrets Act is another measure which we owe to Lord Curzon's Government. It was passed in the face of the unanimous opposition of both the European and the Indian communities.

I trust, I have not done any injustice to Lord Curzon. Indeed I think I might without any difficulty have made out a stronger case, but the half is sometimes better than the whole. I have not said aught in malice and have carefully avoided rhetoric. Gentlemen, it is always disagreeable to have to speak of one's self, but I am bound to say that I am not one of those who purchase their opinions for an anna or less a day, nor am I in the habit of calumniating my opponents who consist

exclusively of my learned friends at the Bar. I have also never taken part in the manufacture of public opinion; but if inspite of my best endeavours to guard myself from those vices against which Lord Curzon raised his warning voice the other day, I have done any injustice to his lordship, I can only console myself with the reflection that there are some infirmities from which the average man cannot altogether free himself. "The contemporaries of superior men," says Goethe, "may easily go wrong about them. Peculiarity discomposes them; the swift current of life disturbs their points of view and prevents them from understanding and appreciating such men." And Lord Curzon we all know is a superior person."

কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিন দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন......"কার্জ্জন সম্বন্ধে তোমার কি মত?" উত্তরে দাদা বলেন......"কার্জ্জন ভাইসরয় হবার উপযুক্ত লোক; তাতে কোনও সন্দেহ নাই! উচ্চ-শিক্ষিতও বটে, কিন্তু ও 'Divide and rule,' এই নীতির দৃঢ় পক্ষপাতী। আমরা এক রকম খেয়ে-পরে চুপ-চাপ বেশ থাকি। কোনও ইংরেজ আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার না করে—এ ওর আন্তরিক ইচ্ছা; কিন্তু আমরা যেন মাথা না তুলি,......ইংরেজের সমকক্ষ হ'তে না চাই,

তাদের কাজের এবং কথার প্রতিবাদ না করি,……এই হচ্ছে ওর প্রাণের বাসনা!"

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ঘোষণা করেন। অমনি কলিকাতায় সভা আহ্বানের ধুম পড়িয়া গেল। ৭ই আগষ্ট টাউনহলে সভা করিয়া, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ ও বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রস্তাব ধার্য্য হইল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় টাউনহল্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, দাদা বাড়ীর সকলকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন……"বাঙ্গালা ভাগ হউক বা না হউক তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না! তবে এই উপলক্ষে যদি স্বদেশী জিনিষের চলন হয়, আর বিদেশী জিনিষের ব্যবহারটা বন্ধ হয়, তাহলে লাভের সীমা থাকে না। দেশের দুঃখ অনেক ঘোচে। কিন্তু আমি ওদের বয়কটের মানে কি বুঝি না! যদি বাঙ্গালা বিভাগ গবর্ণমেণ্ট তুলে দেয়, তাহ'লে কি আবার বিলাতী জিনিষ চালাতে হবে?

"আমাদের সব কাজেই যেন একটা হুজুগ। বক্তৃতাই দি, বা কাঁদি-কাটি…যাই করি, এ সবে কিছু হবে না,……এতে উন্নতির কোনও আশা নাই! ইংরেজ তার নিজের স্বার্থের জন্যে যেটুকু দরকার, তা সে করবেই করবে! হিন্দু-মুসলমানে যাতে সদ্ভাব না থাকে, হুজুরদের তো সে চেষ্টা যথেষ্টই আছে! আবার এ এক কাণ্ড;……বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতেও মিলে-মিশে থাকতে পাবে না—এই তাদের মনের কথা!"

"হিন্দু-মুসলমানে একতা আর গায়ের বল না হ'লে আমাদের

কোনও উপায় নাই। যেদিন আমাদের ঐ দুইটা হবে, তার পরদিনই ওদের সায়েস্তা হ'তে হবে। তা না হ'লে শেষে আমাদের দেশের লোককে কেবল ওদের বাবুর্চী আর বেহারার কাজ করে মরতে হবে। আমার মতে ও সব বক্তৃতা-টক্তৃতা না করে চুপ-চাপ থাকা ভাল। যা ইচ্ছা যায় ওরা করুক গে। সবাই আমায় ধরে, তাই কি করি; শুধু চেঁচিয়ে মরি!

"দেখ না, আমরা একটু নুন খাব,...নিজেদের দেশের জিনিষ,—সমুদ্রে, পাহাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া যায়; তার জন্য টেক্স দিতে হবে! এর চাইতে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার আর কি হ'তে পারে? সেই নুনের টেকস্ তো[illegible]র জন্য দেশ শুদ্ধ লোক এত চেঁচামেচি করছে,...কই! টেক্স তুললে [illegible]...না তুলবে?

"কুকুরটা হাউ-হাউ ক'রে চেঁচালে, চোর যেমন এক টুক্‌রা মাংস ফেলে দিয়ে, তখনকার মত তার মুখ বন্ধ করে, ইংরাজদের কাছে আমাদের দশাও তেমনি হয়েছে। তবে আমি নিজেদেরও কথা বলি,...'আমাদের জাতিরও যথেষ্ট দোষ আছে।' যাকে যেমন পায় মানুষ তাকে তেমন করবে তো? নিজের স্বার্থ জগতে কেউই ছাড়ে না!

"এই যে স্বদেশী আর বয়কট আরম্ভ হ[illegible], এটা দেশের লোক সবাই এক হয়ে চিরদিন চালাক দেখি! এতে বিশেষ কোনও কষ্ট নাই, অথচ ইংরাজদের তাতে জীভ্ বের হ'য়ে যাবে। কিন্তু দেখে নিও; কখনও এ চলবে না! আমি আমার জাতের স্বভাব জানি। এটা একটা হুজুগ হয়েছে, কিছুদিন পরে সব থেমে যাবে।"

দশম অধ্যায়

এই সময় জাতীয় বিদ্যালয় ও টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল স্থাপিত হইল। দাদার বহু দিবস হইতে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, দেশে একটা ভাল টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল হয়। তিনি প্রায় বলিতেন—"বাঙ্গালীর ছেলেদের সকলেরই ইচ্ছা বি-এল পাশ করে উকীল হয়। যদি সবাই উকীলই হয়, তাহলে যে শেষে কারও তাতে আর অন্ন জুটবে না। একটা টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল হ'লে, সেখানে কিছু শিখে লোকে বরং করে খেতে পারবে।"

এই বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল স্থাপিত হওয়ায় তিনি সাগ্রহে তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ইহার পর এক দিন টি, পালিত আসিয়া দাদাকে বলিলেন···"আমি টাকা দিয়ে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলটাকে ভাল রকম দাঁড় ক'রাতে চাই। তুমি এতে কি বল?"

উত্তরে দাদা বলিলেন···"যদি তা কর, তাহ'লে তুমি দেশের একটা মহা উপকার ক'রবে।" পালিত বলিলেন···"তোমাকে কিন্তু চেয়ারম্যান্ হ'তে হবে।" দাদা বলিলেন···"দেখছ তো, আমি নিজের কাজ নিয়েই অস্থির; আমার এক মুহূর্ত্তও সময় নাই,···তা ছাড়া আমি ও-সব বিষয়ের কিছু জানি না,···বুঝি না।···আমি চেয়ারম্যান হ'তে পারব না,···আমার দ্বারা ও-সব হ'বে না।"

পালিত সাহেব বলিলেন…"তোমাকে দেখতে শুন্‌তে বা কিছুই করতে হবে না। তুমি স্কুলের চেয়ারম্যান্, এই নামটা কেবল থাক্; তা হ'লে দেশের লোক বুঝবে যে,…'এটা একটা হুজুগে কাণ্ড নয়,…এ একটা খাঁটি কাজ হচ্ছে।' লোকের এ বিশ্বাসটা তোমার উপর আছে যে, তুমি যাতে-তাতে যোগ দিয়ে মেতে বেড়াও না। কারণ এতে সাধারণেরও সাহায্য পাওয়া চাই। একটা ভাল রকম টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল করতে অনেক টাকার দরকার, আমার অত টাকা নাই।"

দাদা তখন চেয়ারম্যান হইতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পালিত সাহেব চলিয়া গেলে, দাদা বলিলেন…"বদ্ মেজাজের জন্য সকলের কাছে ত গালাগালি খেয়ে মরি। পালিত যে বললে,… 'দেশের লোকের তোমার উপর বিশ্বাস আছে, তুমি হুজুগে পড়ে যা তা কর না' এতে মনটা কতকটা খুসি হলো। কথাটাও ঠিক্। দেখ না? এ হবে সে হবে,…চাঁদা করে কত টাকা উঠ্‌ল…শেষে কিছুই হলো না; সব ফাঁকা। এতে লোক যে লোকের উপর বিশ্বাস হারায়! দেশের কর্ত্তারা তা বুঝেন না!

"ইণ্ডিয়ান্ ষ্টোর হবে, চাঁদা তুলতে লাগল। আমি তখনই তাদের বলেছিলাম…কোট্, পেণ্টালুন পরে পাখার নীচে বসে হাওয়া খেয়ে ব্যবসা হবে না,…ও করতে যেও না,…চল্‌বে না। শেষে হলও তাই!

"আমার বন্দেমাতরম্ দেশ্‌লাইএর কারখানা দেখ না। দুজন জাপান হ'তে দেশলাই তৈরী করা শিখে এসে আমায় বল্‌লে…

'আমরা বিদেশ হতে কাজ শিখে এখানে এসে যদি কাজ করতেহ না পেলাম, তবে আমাদের বিদেশে গিয়ে কাজ শিখ্‌বার ফল কি?' কথাটা ঠিক্‌ই বুঝলাম। তাই তাদের পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে কল ক'রে দিলাম। শেষে দেখলাম, তারা কিছুই শেখে নাই। তাই সব নষ্ট হল। আমার যে ত্রিশ হাজার টাকা গেল, তাতে কিছু ভাবি নাই; কিন্তু লোকে আর এর পরে এ-সব কাজে টাকা দিতে চাইবে না।

"আমার এই বন্দেমাতরম্‌ কল যদি ওরা ভাল করে চালাতে পারত, তা হ'লে দেখতে কল্‌কাতায় আরও দু-চারটা দেশ্‌লাইএর কল হয়ে যেত।

"যে কাজ করব সেটা ভাল রকম শিখে যদি তাতে লাগা যায়, তবে নিশ্চয়ই সেটা সফল হয়। তার একটা দৃষ্টান্ত দেখ না। বেঙ্গল্‌ কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌। উপযুক্ত লোক উপযুক্তরূপে কাজ শিখে তবে ওতে লেগেছিল বলেই তো আজ বেঙ্গল কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌এর এত উন্নতি!"

যখন মজঃফরপুরে বোমার হাঙ্গামা, কলিকাতাতে মুরারী পুকুরে বোমার কারখানা আবিষ্কার ও পুলিশ কর্তৃক রাজবিদ্রোহী বলিয়া ছেলের দল গ্রেপ্তার হইতে লাগিল, তখন দাদা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্রবাবু দাদার নিকট আসিয়া বলিলেন..."দেখুন, দুষ্টবুদ্ধি লোকে ছেলেদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে এ সব করাল; এখন সাম্‌লান দায় হবে!" দাদা বলিলেন..."এখন তো আর কোনও হাত নাই, তবে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হ'য়ে

কাগজে কিছু লেখা-লেখি কর। গ[illegible] একটা যা-তা না করে বসে, তাই দেখগে।"

গবর্ণমেণ্ট ক্রমে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি দেশ-নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেন। বিদ্রোহী আইন প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই সময় দাদা বলিলেন…"গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে লোকের মাথা গরম হয়ে উঠেছে,…সত্য, কিন্তু তা বলে না বুঝে-সুঝে একটা যা-তা করে ফেলা ঠিক হয় নাই। এখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা কত! জনকতক ছেলেতে তাদের কি ক'রতে পারে! দেশের ছেলে ক'টা গেল ; আর জনকতক নিরীহ লোকও হয় তো খুন হবে! আর গবর্ণমেণ্টও যা-তা আইন করে দেশের লোকগুলোকে উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তুলবে। তবে.. হাঁ! এতে কর্ত্তারা এটা বুঝবে…যে, ওরা আমাদের লাথি, জুতা যাই মারুক আমরা চুপ করে সে সব সয়ে থাকব, তা আর চল্‌বে না!

"তবে আমার বড় দুঃখ,—ওরা অরবিন্দকে ধরেছে। অরবিন্দ লেখাপড়া-জানা প্রকৃত ভদ্রলোক। দেখ না? মানুষের কি স্বার্থত্যাগ! এখনও ছেলেমানুষ বল্‌লেই হয়! স্ত্রী আছে, ভাই-বোন আছে, এদিকে তো সংসারী লোক; কিন্তু বেঙ্গল্ ন্যাশনাল্ কলেজে ছেলেদের পড়াবার জন্য বরদার পাঁচশ[illegible] টাকা মাহিনার চাকরী ছেড়ে পঁচাত্তর টাকা মাহিনাতে এখানে এসেছিল। ক্রাইষ্ট, চৈতন্তের মত ওরা এক রকম পাগল লোক!"

এই সময় এক দিন গবর্ণমেণ্ট হাউস্ হইতে আসিয়া দাদা বলিলেন…"দেখ, মিণ্টো প্রকৃত ভদ্রলোক। আমি এক জায়গা

হতে আভাস পেলাম যে, গবর্ণমেণ্ট্ একটা কঠোর সিডিসান্ আইন চালাবার মতলব ক'রছে। তাই মিণ্টোর সঙ্গে দেখা ক'রে সেটা সত্য কি না জিজ্ঞাসা করলাম। মিণ্টো বল্‌লেন…'তোমাদের ছেলেরা যা ক'রছে, তাতে গবর্ণমেণ্টের ও রকম আইন না ক'রে উপায় কি?'

"আমি বল্‌লাম…'ছেলেরা যা করেছে, অতি সামান্যই। তার জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি এ রকম আইন করেন, তা হ'লে দেশের লোক ভাববে…ছেলেদের দু'চারটা বোমা করা দেখেই ইংরাজ গবর্ণ-মেণ্টের এত আতঙ্ক। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কি সেটা ভাল হবে? আপনারা একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকুন, দেখবেন সব থেমে যাবে।'

"তখন মিণ্টো আমায় বল্‌লেন…'আপনি ঠিক করে বলুন দেখি, কোন রাজামহারাজা বা পয়সাওয়ালা লোক টাকা দিয়ে ছেলেদের সাহায্য করছে কি না?' আমি বললাম…'কখনই নয়! আপনিই ভেবে দেখুন না! কটা বন্দুক, রিভল্‌ভার্ ওরা যোগাড় করেছে? অতি সামান্যই; শুনি রিভল্‌ভার গোটা কতক যা ওরা পেয়েছে, ফিরিঙ্গীদের ঘুস্ দিয়ে তাদের দ্বারা দোকান হ'তে কিনিয়ে নিয়েছে।'

"মিণ্টো আমার কথায় বিশ্বাস করে বল্‌লেন…'তা বুঝলাম,… এ সব তেমন কিছু নয় বটে। তবে এখন আমরা নরম হলে, যদি এর পর গুরুতর একটা কিছু হয়ে পড়ে, তখন তো আমারই উপর দোষ পড়বে?' আমি বল্‌লাম…'তার কোনও সম্ভাবনা

নাই। আপনি ভেবে দেখুন, দেশের সব লোক যদি ঠিক্ থাকে, জনকতক ছেলে-ছোকরায় আপনাদের কি কর্‌তে পারে? চঞ্চল বুদ্ধির দরুণ ছেলেরা বিপথে চলেছিল। এর পর ছেলেরা নিজেরাই এর জন্য অনুতপ্ত হবে।' যতদূর বুঝলাম্, মিণ্টো ধীরে, সুস্থে ও নরম হ'য়ে চল্‌তে ইচ্ছুক। তা হলেই ঢের। ও যদি একটা জবরদস্ত গভর্ণর হতো তা হ'লে এ সময়ে একটা যা-তা করে ফেল্‌লে, আমরা ওদের কি আর করতে পারতাম? খানিকটা বক্তৃতা করে চেঁচাতাম, আর একটু গালাগালি দিতাম··· এই ত?"

একাদশ অধ্যায়

ইংরাজী ১৯০৭-১৯০৮ সালে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন্ পুনর্গঠনকালীন তদানীন্তন ল মেম্বার দাদাকে এক দিন ডাকিয়া পাঠান। দাদার বাত হইয়াছিল, তখন অনেকটা আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি গিয়া ল মেম্বারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, ল মেম্বার দাদাকে বলিলেন…"লর্ড মিণ্টো আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন যে…'দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের পুনর্গঠনে আপনাকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে হইবে।' "

দাদা উত্তরে বলিলেন…"আমার শরীর এখন ভাল নয়। বাতে আক্রান্ত হয়েছি। আর অতদিন কাছারি কামাই ক'রলে, আমাকে বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হবে। আমার মক্কেলরাও অনেক অসুবিধায় পড়বে।"

ইহাতে ল মেম্বার কতকটা পরিহাসচ্ছলে দাদাকে বলিলেন… "ও আর তোমার পক্ষে বিশেষ কি? তুমি তো সাধারণে অনেক টাকা দান করিয়া থাক; না হয় গবর্ণমেণ্ট্‌কে কিছু টাকা দান ক'রলে মনে কর? আর তুমি তো দেশের হিত করতে চাও; এ কাজ করলে তো দেশের হিত করাও হবে। শরীর অসুস্থের কথা যা বল্‌ছ, সিমলায় সামার হিলের হাওয়ায় সব আরাম হয়ে যাবে। তা, তুমি আর অমত ক'র না। তোমাকে এ কাজে থাক্‌তেই হবে!"

অগত্যা দাদা স্বীকৃত হইলেন। লর্ড মিণ্টো তাঁহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করিয়া লইলেন। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন পুনর্গঠনের সময় যখন দাদা সিমলায় ছিলেন সে সময় তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে লাটসাহেবের বাড়ীতে রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইত।

এক দিন এইরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়া বলিলেন··· "আজ ভাল খাওয়া হয় নাই। অরবিন্দর হ'য়ে আজ প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সওয়াল জবাব করেছি। কোর্টে যেমন আগ্রহে সওয়াল জবাব করি, ঠিক তেমনিভাবে! কোর্টে জজের সামনে দাঁড়িয়ে এ টেবিলে খেতে খেতে···বসে; এই যা তফাৎ।

"খেতে বসেছি, খানিক পরেই লেডি মিণ্টো আমায় জিজ্ঞাসা করে বস্‌লেন...'আপনি মুরারী পুকুরের বোমার কারখানা দেখেছেন কি?' আমি বললাম 'মুরারীপুকুর কোথায় তা আমার জানা নাই;···বোমার কারখানা আমি দেখি নাই' তাতে লেডি মিণ্টো একটু আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন··· 'আপনি এত দিন কলিকাতায় আছেন, আর কল্‌কাতার ভিতর মুরারীপুকুর কোথায়, তা জানেন না?' আমি উত্তর করলাম··· 'মুরারীপুকুর কল্‌কাতার উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে। তবে ওধার দিকে আমি কখনও যাতায়াত করি নাই; তাই সে জায়গাটা ঠিক কোথায় জানি না।'

"তখন অমনি কয়জন মেম্বার একসঙ্গে বলে উঠলেন····· 'অরবিন্দ কি ভেবেছিল, ছেলেদের লাগিয়ে দিয়ে আমাদের এদেশ

থেকে তাড়িয়ে দেবে ? দিয়ে আপনিই ভারত সম্রাট্ হবে না কি ?' আমি বল্‌লাম……'আপনারা এ কথা বল্‌ছেন কেন ?' তাঁরা রাগ-রাগ ভাবে বল্‌লেন……'আপনি ও লোককে চেনেন না! সিভিল্‌সার্ভিস্ চাকরি পায় নাই বলে ওর আমাদের উপর মর্ম্মান্তিক রাগ আছে, সেই জন্মই একটা দল পাকিয়ে এসব করছে। আমরা ওকে সাজা দেবই…দেব!'

"আমি তখন তাদের বেশ করে শুনিয়ে দিলাম যে 'অন্ম কিছু তত পারি না পারি' আমার মানুষ চিন্‌বার ক্ষমতা কতকটা আছে, যেটার জন্ম আমি অনেকের কাছে গর্ব্ব করে থাকি। আপনারা অরবিন্দকে যা চিনেছেন, তার চেয়ে অনেক গুণে ভাল রকমে তাঁকে আমি চিনি। তাঁর সিভিল্‌সার্ভিসের চাকরি না পাওয়ার কথা যে বলছেন,—সে যদি ও চাকরি পেত, তা হ'লেও কয়েক মাসের মধ্যেই সে আপনাদের ও ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরিতে জবাব দিত। ও রকম চাকরি করা অরবিন্দর মত লোকের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। চাকরি করে তো লোকে পয়সার জন্ম, অরবিন্দ পয়সার কি তোয়াক্কা রাখে ? তা যদি না হ'তো তাহ'লে যে লোক বরদায় প্রফেসার ছিল,……পাঁচশত টাকা মাহিনা পেতো, সে চাকরি ছেড়ে পঁচাত্তর টাকা মাহিনাতে সে বেঙ্গল্ ন্যাশনাল্ কাউনসিল অফ্ এডুকেশন্‌এ মাষ্টারি করতে আস্‌ত না! অথচ স্ত্রী, ভাই, ভগিনী নিয়ে, সে সংসারী লোক। দান-টানও তাঁর আছে! আপনারা বল্‌তে পারেন,…'এ রকম স্বার্থত্যাগ জগতে কয়জন দেখাতে পেরেছে ?"

"অরবিন্দ হাবা-গোবা নয়, উন্নতমনা, খুব উচ্চশিক্ষিত

লোক! তাঁর এটুকু বুদ্ধি আছে যে কতকগুলা স্কুলের ছেলে, আর কয়েকটা বোমা, রিভল্‌ভার নিয়ে ভারতবর্ষ হ'তে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে তাড়াতে পারা যায় না। আর সে এত নিষ্ঠুর, নীচ, ও অবিবেচক নয় যে, তার কোনও কু-অভিসন্ধি পূর্ণ করার চেষ্টায় তার নিজের ভাই, ছাত্র ও আপন জনকে মৃত্যু মুখে ফেল্‌বে...... দশজন নিরীহ দেশের লোককে অকারণ খুন করাবে!

"তবে যদি বলেন......'সে দেশ স্বাধীন ক'রে আপনি সম্রাট হ'তে চায়,' তার উত্তরে আমি বলি,......সে কে না চায়? চিরকাল পরাধীন থাকে—এ কোন্ মানুষের ইচ্ছা? কাল যদি দেশের লোক স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে দাঁড়ায়—আমি ধন প্রাণ দিয়ে সকলের আগে যাব! কিন্তু তা ব'লে আমি প্রাণান্তেও স্বাধীনতা পাবার আশায় একজনকেও গুপ্ত হত্যা করতে পরামর্শ দিতে পারব না।

"আপনারা যদি অরবিন্দকে *সাজা দিবেনই ঠিক্ করে রেখেছেন,* তবে আর ওকে আদালতে নিয়ে গিয়ে মিছে বিচার অভিনয় করছেন কেন? ওর উকীল, ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করবার তেমন পয়সা নাই। ওর ভগ্নী সাধারণের কাছে অর্থ সাহায্য চাচ্ছে। মিছে এসব কষ্ট ওরা আর পায় কেন? আরও অনেক কথা বলেছি। হুজুররা কেউ আর টুঁ শব্দটি ক'র্‌লে না; দেখিই না আগে, অরবিন্দর কি হয়! আমাদের তো আর কোনও ক্ষমতা নাই! এক, দুকথা শুনান, তা সেটা এক দিন আবার কাউন্সিলে হুজুরদের সাধ মিটিয়ে শুনিয়ে দেব।"

দ্বাদশ অধ্যায়

কংগ্রেসের সূচনা হইতে দাদা অর্থ দিয়া উহার পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বলিতেন..."কংগ্রেসটী আমাদের দেশের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর প্রতিষ্ঠান। এর দ্বারা অন্য কিছু সুফল নাই হউক্, বৎসরে একবার ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক যে একত্র হ'য়ে কয়দিন আলাপ করা যায়, সেইটাই তো মহালাভ।"

ইংরাজী ১৯০৭ সালে সুরাট্ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট্ হইবার জন্যে গোখ্‌লে দাদাকে অনুরোধ করেন। দাদা তাহাতে আপত্তি জানাইয়া বলেন......"আমার এখন শরীর ভাল নয়, আর এ বয়সে অতটা পথ রেলে যাতায়াত করাও আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হবে। এই একস্‌মাস্ ছুটীর দশ পনর দিন পুরীতে সমুদ্রের হাওয়ায় থাক্‌লে আমার স্বাস্থ্যের অনেক উপকার হবে।"

গোখ্‌লে বলিলেন......"আপনি কংগ্রেসের সভাপতি হ'তে সম্মত হবেন্ বুঝেই আমরা এক রকম আপনাকেই সভাপতি স্থির করেছি। আপনি আর এতে অমত কর্‌বেন না।" দাদা সভাপতি হইতে সম্মত হইলেন।

কংগ্রেসের নয় দশ দিন পূর্ব্ব হইতে তিলকের লোক পত্র ও টেলিগ্রাম যোগে দাদাকে জানাইতে লাগিল..."আপনি যেন এ

বৎসর কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট্ না হন্। আমরা তিলক্‌কে প্রেসিডেণ্ট স্থির করিয়াছি।”

এদিকে গোখ্‌লে তাহা জানিতে পারিয়া টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম্ পাঠাইয়া দাদাকে বলিতে লাগিলেন……“আপনি মনস্থির রাখিবেন, কাহারও কথায় মত পরিবর্ত্তন করিবেন না।”

শেষে চিত্তরঞ্জন দাস এক দিন সকালে আসিয়া দাদাকে তিলকের অভিপ্রায় জানাইলেন। দাদা বলিলেন……“আমি এমন বিপদে কখনও পড়ি নাই। গোখ্‌লের জেদা-জেদিতেই আমি প্রেসিডেণ্ট্ হ’তে স্বীকার করেছি। সে অনবরত আমায় টেলিগ্রাম ক’রছে—Please be steady, don’t change your mind, এখন আমি কি করি, তুমিই বল? এ সময় আমার বাত হয় তো আমি বেঁচে যাই।”

চিত্তরঞ্জন দাস বলিলেন……“এ রকম অবস্থায় আপনার মত বদলান উচিত নয়। আমাকে তিলক লিখেছেন, তাই আমি আপনাকে একবার বলতে এলাম।”

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট্ হইয়া দাদা যথা সময়ে সুরাট্ যাত্রা করেন। তিলকের দল সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে দাদা সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে পর তাঁহাকে সভাপতি পদে বৃত করিবার প্রস্তাবনা কালে তিলক দাদার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। গোখ্‌লে তাঁহাকে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক তথা হইতে

সরিয়া যাইতে বলিলেন। তিলক উত্তর করিলেন যে, বলপ্রকাশ ব্যতীত কোন প্রকারেই তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন না।

দাদা তিলকের হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—"তিলক, তুমি দেশের মস্তক স্বরূপ। অপর কেহ হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু তুমি যদি কংগ্রেসের অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া দাও, তাহা হইলে কংগ্রেসের বিরোধীদের নিকট আমাদের সকল দেশবাসীকেই অপদস্থ ও হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। তুমি এ কার্য্য হইতে বিরত হও। যদিই তোমার প্রতি কাহারও দ্বারা কোন প্রকার ত্রুটী হইয়া থাকে, তুমি তোমার দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তাহা বিস্মৃত হও। 'কংগ্রেসের অধিবেশনে বাধা দিও না।"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিলক তাঁহার সঙ্কল্পে অটল রহিলেন। এদিকে তখন মণ্ডপের মধ্যে উপবিষ্ট দর্শক-বৃন্দের মস্তকের উপরি দিয়া অবাধে যষ্টি, ইষ্টক, এমন কি পাদুকা পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহাতে দাদা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, সকলে তাঁহাকে সেস্থান হইতে অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাওয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন ভঙ্গ হইয়া গেল।

দাদা সুরাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন......"এইবার হ'তে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি রেসা-রেসি আরম্ভ হ'ল। কংগ্রেসের শক্তি এবার ক'ম্‌লো। এ রকম চল্‌লে কংগ্রেসই যে বেশী দিন থাক্‌বে তা বোধ হয় না। আমরা নিজের স্বার্থের একটুও হানি স্বীকার করবো না, আপনার জেদ্‌টা পুরামাত্রায় বজায় রাখবো... আরে, তাতে শেষে নিজেদেরই যে সর্ব্বনাশ হয়, তা আমরা বুঝি

না! গোড়া হতে তো সব আমি দেখে আসছি,:মেটাই বল, সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যেই বল, আর যেই বল, এক অশ্বিনী বাবু ছাড়া সকলেরই এতে কিছু না কিছু স্বার্থ আছে। আর সেটুকু বজায় রাখ্‌তে সবাই তৎপর। সকলে মিলেমিশে যাতে সুশৃঙ্খলে কংগ্রেসে ভাল কাজ হয়, দেশের মঙ্গল হয়, একমাত্র অশ্বিনী বাবুরই এই আন্তরিক ইচ্ছা দেখি।"

"কংগ্রেসে নারোজী স্বরাজের কথা তুলিলেন। দেশের লোক স্বরাজের যা মানে ক'রে, তাই পাবার আশা করছে,—ইংরাজ কি তা কখনও দেবে? চেয়ে চিন্তে তা কখনও পাওয়া যাবে না! তবে স্বরাজ রূপ ঘরে ঢুক্‌বার জন্য আমরা যদি অনবরত তাদের কপাটে ঘা দিতে থাকি, তাহ'লে তারা অনিচ্ছায় একটু একটু ক'রে দরজা খুল্‌বে, যে পর্য্যন্ত তাদের বিন্দুমাত্র স্বার্থের হানি না হয়। তার পর মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও আর একটুও নয়! ওরা তো স্পষ্টই আমায় একবার বলেছিল……'রাসবিহারী বাবু কি মনে করেন, আমরা এদেশে থেকে কেবল পুলিশের কাজ ক'রব না কি?"

"আমরা অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানেডার মত স্বায়ত্ত [illegible]ন পেতে চাই। কিন্তু আমাদের দেশের লোক ভাবে না যে, [illegible] ইংরাজেরই জাত ভাই। মনে কর যদি অষ্ট্রেলিয়ার লোকগুলা ইংল্যাণ্ডেই জন্মিয়ে ইংল্যাণ্ডেই থাকত, তাহ'লে তারা তো সকল রকমে ইংরাজের সমানই অধিকার পেত। ইংল্যাণ্ডকেই তাদের দিন গুজরান্ করাতে হতো। তার চেয়ে অতগুলা লোক দেশ থেকে সরে

গিয়ে আপ্‌নার আপ্‌নার ক'রে ক'র্ম্মে খাচ্ছে। ইংরাজ ভাবে... 'তাতেই তো ওদের লাভ। তার পর তাদের উপর যত দিন যেটুকু প্রভুত্ব চলে, চলুক না। ক্রমে ক্রমে সবই তো তাদের ছেড়ে দেব।' তবে অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, আমেরিকার মত হ'তে সাহস পাবে বলে বোধ হয় না ; বা তারা তা চাইবেও না, ইংরাজের সঙ্গে একটু বাঁধন রেখে দেবে, পাছে অন্য কেউ এসে তাদের ঘাড়ে চাপে...সেই ভয়ে।

"কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরাজের সম্পর্ক যে আলাদা। ওরা যদি আমাদিকে এ দেশের কর্ত্তা করে দেয়, তাহলে ওদের দশা কি হ'বে? নিজেরা অন্নাভাবে মরে আমাদের খেতে পরতে দিয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ক'রে দেবে,—এ উদার নীতি ইংরাজের কুষ্ঠিতে লেখে নাই।"

"একজন বড় সাহেব আমাকে স্পষ্টই বলেছিলেন......'ইচ্ছে ক'র্‌লে আমরা আয়ার্ল্যাণ্ডকে চিরদিন অধীনে রাখতে পারি। ভারতবর্ষকে চিরদিন অধীনে রাখতে পারব কি না সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাক্‌তে পারে। কিন্তু যত দিন থাক্‌বো, এখনকার মত ক'রেই থাক্‌বো। যখন যেতে হ'বে একবারেই যাব। তোমাদের সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ইংরেজ এ দেশের লোকের আজ্ঞাবহ হ'য়ে থাকবে, এ যেন তোমরা স্বপ্নেও কখন না ভাব। তবে এ দেশের লোক যদি কখনও উপযুক্ত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট্‌ তোমাদের কিছু ক্ষমতা দিতে পারে।'

"উত্তরে আমি তাকে বলেছিলাম......'সাহেব, তোমার কথা

শুনে সুখী হলাম, যে তুমি স্পষ্ট কথা বলে দিলে। অন্যের কাছে যে সেটাও শুন্‌তে পাই না।”

দাদা সুরাট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট্‌ হওয়ায় তিলকের দল সে কংগ্রেসের অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া দিলেন বলিয়া মান্দ্রাজবাসীরা পর বৎসর মান্দ্রাজ কংগ্রেসে দাদাকে প্রেসিডেণ্ট্‌ হইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। কি কারণে জানি না, মান্দ্রাজবাসীদের প্রতি চিরদিন দাদার একটা কেমন আন্তরিক টান ছিল। সেই হেতুই তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাদের অনুরোধে মান্দ্রাজ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট্‌ হইয়াছিলেন।

সুরাট্‌ কংগ্রেসের অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া দেওয়ায় অনেকের আশঙ্কা হইয়াছিল যে কংগ্রেসের আয়ুষ্কাল বুঝি বা এখানেই শেষ হইল। সে কারণ মান্দ্রাজ কংগ্রেসের অভিভাষণে দাদা নিজ স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছিলেন.........

"The fears which for months haunted the minds of some of us have proved groundless. The genial predictions of our enemies so confidently made have also been falsified. For the Indian National Congress is not dead nor has Surat been its grave. It has been more than once doomed to death but rely upon it, it bears a charmed life and is fated not to die. It is true a few men have left us, but the congress is as vigorous as ever. We

have now closed up our ranks and though some of us clung convulsively to the hope that those who have deliberately committed political suicide would still continue to fight the good fight and keep the faith they soon found out their mistake. There can be no reconciliation with the irreconcilable."

যায়, আর স্কুল না চলে, তবে তো সবই গেল। তার চেয়ে ইউনিভারসিটিতে টাকাটা দিলে একেবারে আর যাবে না।'

"আমার এ অনুমান যদি প্রকৃত হয়, তাহ'লে দেশের লোক সব কাজেই উপযুক্ত নয় ভেবে যদি তাদের বিশ্বাস না করা যায়, তবে ত দেশের ভাল হবার আর কোনও আশাই নাই। বিদেশী গবর্ণমেণ্ট্ কিছুই করবে না,—দেশী লোক, দেশী লোককে কোনও কাজের উপযুক্ত নয় বলে বিশ্বাস করবে না,...তবে হ'বে কি? কেবল বক্তৃতা, আর গবর্ণমেণ্টের কাছে ভিক্ষা চাওয়া। আর না দিলেই তাকে গালাগালি! এ রকমে কোনও জাতি আপনাদের উন্নতি করতে পারে না;—এ একেবারে অসম্ভব!"

গোখ্‌লের প্রতি দাদার ধারণা খুব উচ্চ ছিল। গোখ্‌লের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য ইংরাজি ১৯১৫ সালের ২রা মার্চ্চ কলিকাতা টাউন্‌হলে যে সভা হয়, তাহাতে দাদা সভাপতির কার্য্য করেন।

সভাতে বক্তৃতা দিয়া আসিয়া দাদা বলিলেন..."লোকের মৃত্যুতে, সভাতে বক্তৃতা করে শোক প্রকাশ করা একটা পদ্ধতি, একটা কর্ত্তব্য মাত্র; কিন্তু গোখ্‌লের জন্য বাস্তবিক প্রাণে কষ্ট পেয়ে শোক প্রকাশ করেছি। ও, দেশের জন্য খুব পরিশ্রম করেছে।

"দেশে কম্‌পল্‌সরি প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি শিক্ষার জন্য, নুনের টেকস্ তুলে দেবার জন্য, বাঙ্গালা ব্যবচ্ছেদ রদ করবার জন্য গোখ্‌লে কাউন্‌সিলে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। গোখ্‌লে

কাউন্‌সিলে যে ভাবে কাজ ক'রেছে, তেমন করে কাজ করবার লোক আর একটি শীঘ্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ একটা দেশের কম ক্ষতি নয়! ওর কাউন্‌সিলে দু একটা কাজ দেখে গুরুদাসবাবু আমায় একবার বলেন...'এ কাজে নিশ্চয় আপনার হাত আছে।' আমি তাতে বলেছিলাম...'এতে আমার কিছুমাত্র হাত নাই। আপনারা জানেন না, গোখ্‌লে ভারি বুদ্ধিমান লোক।'

"কিন্তু গুরুদাসবাবু বা হেরম্ব মৈত্র আমার এ কথা যেন বিশ্বাস করতে চান্ না। অবশ্য হেরম্ব মৈত্রের পড়াশুনা বা ইংরাজিতে যে রকম দখল, গোখ্‌লের সে রকম কিছু ছিল না, তবে আমি বুদ্ধিমানের কথা বল্‌ছি,...আমাকে তো লোকে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান বলে,...নিজের হীনতা কেউ স্বীকার করতে চায় না, কিন্তু আমি বল্‌ছি...'গোখ্‌লে আমা অপেক্ষাও বুদ্ধিমান ছিল।"

"ইংরাজরা বলে ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালী বুদ্ধিমান জাতি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান। তেলাঙ, রাণাড়ের মত জজ্ বাঙ্গালায় কে হয়েছে? 'সিনিয়ার র‍্যাঙ্‌লার প্যরাঞ্জপে' আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে কেউ নাই। আমাদের চেয়ে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিতের সংখ্যাও বেশী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু বা পি, সি, রায়ের মত লোক ওদের নাই! এই তিনটী বাদ দিলে আমরা ওদের কাছে থই পাই না।"

দাদা বলিতেন..."আমায় যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে...'বাঙ্গালীর

মধ্যে কার কার জীবন-চরিত থাকা উচিত?' আমি তাহ'লে কোন রকম ইতস্ততঃ না করে বলি...'রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের!' এই দুইজন নিঃস্বার্থভাবে আপন জীবন সঙ্কটাপন্ন করেও দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

"গুচ্ছের বক্তৃতা দিলে, আর টাকা থাকলে কিছু টাকা দিলেই দেশের কাজ করা হয় না। প্রাণ দিয়ে দেশের জন্য কাজ করা—সে একটা আলাদা জিনিষ। সে কেবল রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ই করেছেন। আমাদের এ হতভাগ্য দেশে ও রকম লোক আর জন্মাবে বলে বোধ হয় না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি দাদার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বলিতেন..."মায়ের প্রতি যাঁর এত ভক্তি তিনি তো দেবতা। তিনি বিদ্যার সাগর না হ'তে পারেন; কিন্তু তিনি যে দয়ার সাগর ছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। দয়াই মানুষকে ঈশ্বর তুল্য করে তুলে! বিদ্যা বিশেষ থাক্ আর নাই থাক্, তাতে কি আসে যায়?"

একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে কথা-প্রসঙ্গে দাদা আমায় বল্‌লেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি আমার বাড়ীতে আছে?" আমি বলিলাম ফটো আছে, পেন্টিং নাই।...এই কথা শুনিয়া তিনি আমায় বলিলেন..."তাঁর একটা পেন্টিং করিয়ে এনে, বা তুমি নিজে করে, আমার বস্‌বার ঘরে রেখো।" আমি তাঁর আদেশমত কার্য্য করিলাম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পৃষ্ঠা—১১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইহার কয়েক মাস পরে দাদার নিজের একখানা প্রতিকৃতি আঁকিয়া, যে স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবিটা ছিল, সেই স্থানে টাঙ্গাইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্রটী পার্শ্বের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দিলাম। দাদা সে সময় সিম্‌লায় ছিলেন। সিম্‌লা হইতে আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবির স্থানে নিজের ছবি, ও অন্য স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি দেখিয়া, আমাকে ডাকিয়া বিরক্তি ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি ওখান থেকে সরালে কেন?"

উত্তরে আমি বলিলাম—"আপনার ছবিটার আয়তন একটু বড় বলিয়া এই ঘরের অন্য দেওয়ালে উহা টাঙ্গাইবার স্থান সংকুলান না হওয়ায়, ও ছবিটা ঐ স্থানে টাঙ্গাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি আপনার বসিবার স্থানের সম্মুখের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়াছি।"

তখন তিনি বলিলেন…"এই কথা ঠিক্ তো? এ' তো ভাব নাই যে, এ ঘরের মধ্যে এই যায়গাটা সকলের চেয়ে ভাল; আমার দাদা বড় লোক, তাঁর ছবিটাই এইখানেই টাঙ্গাই?"

উত্তরে আমি বলিলাম…"না; বরং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবিটাই ভাল জায়গায় টাঙ্গান হয়েছে।"

তখন তিনি একটু আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন…"বেশ ক'রেছ; তা যদি না হতো, আমার ছবিটা এখনই পুড়িয়ে ফেল্‌বার হুকুম দিতাম। তোমার দাদার চেয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কোটি কোটি গুণ বড়লোক। অমন লোক এ দেশে জন্মে না।

পয়সা থাক্‌লে মানুষ দান করতে পারে। মানুষের স্মরণ-শক্তি ও বুদ্ধি ভগবান্‌-দত্ত, কিন্তু যাঁর হৃদয় দয়াতে পূর্ণ থাকে, আর সেই দয়া যিনি মানুষের উপর দেখাতে পারেন, তিনিই মানুষের মধ্যে দেবতা। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইরূপ দেবতাই ছিলেন।”

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টরের কার্য্য করিতেন, তখন তিনি কার্য্যোপলক্ষে খণ্ডঘোষ অঞ্চল দিয়া যাইলে, খণ্ডঘোষে আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন।

এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার দাদাকে বলিয়াছিলেন—“ওরে রাসবিহারী, তোরা তো খুব বড়লোক। এক সময়ে আমি প্রায়ই খণ্ডঘোষে তোদের বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌তাম।”

জীবনে কেবলমাত্র এইটিতে দাদা গর্ব্ব অনুভব করিয়া বলিতেন—“বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজমুখে আমাকে বলেছিলেন—‘তোরা বড়লোক।’ যাদের বাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিথি হ’য়ে থাকেন, তারা নিশ্চয়ই বড়লোক!—ভাগ্যবান্‌ও বটে!”

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"এটা আমাদের সমাজের একটি উৎকৃষ্ট প্রথা ; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়—এটা ক্রমেই গেল। কেউ কেউ বলে, 'আমরা ইংরাজী ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়্‌ছি বলেই এমনটা হ'ল।' আমি কিন্তু তা বলি না। আসল কারণ—আমাদের সব দিকেই ধর্ম্মভাব ক'মে যাচ্ছে। অরবিন্দ ঘোষ তো উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত লোক,—ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ায়, ইংরেজের সঙ্গে থেকে ও তো ছেলেবেলা হ'তে বড় হয়েছে,—তবু সে লোক কেন বলে,—'দরিদ্র-পালন ধর্ম্ম, আত্মীয়-পালন মহা ধর্ম্ম।' আসল কারণ ওর ধর্ম্মগত প্রাণ।

"আগেকার লোক দরিদ্র-পালন, আত্মীয়-পালন একটা মহাপুণ্যের কাজ ভাবৃত। তাই একান্নবর্ত্তিতা আমাদের সমাজে খুব প্রবল ছিল। এখন লোকের সে ভাব চ'লে গেছে ; বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে! আর তাদের দেখেই তো নিম্নশ্রেণীর লোক সব শেখে। কাজেই ওদের মধ্যে এখনও ওটা যা কিছু আছে, তাও শীঘ্র শীঘ্র যাবে।

"অনেক শিক্ষিত লোক আমায় বলে—'আপনি গরীব, আত্মীয়, স্বজনকে প্রতিপালন করেন।' তারা ভাবে এ যেন আমার একটা খুব যশোগান করা হ'ল। কিন্তু এটা যে সকলেরই কর্ত্তব্য,

এ করতে যে সকলে ন্যায়তঃ বাধ্য, তাদের সেটা কি মনে আসে না?"

"ভগবান যাঁদের মধ্যে আমাকে পাঠিয়ে ধন-সম্পদ্ দিয়েছেন, তাঁদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচাবার চেষ্টা না করে নিজে যদি গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে, আমোদ আহ্লাদ করে কেবল দিন কাটাই, তাহলে আমায় ভগবানের কাছে অপরাধী হতে হবে! তাঁর অভিশাপে পড়তে হবে! হিন্দু আমি, আমার এ বিশ্বাস খুবই আছে। এর জন্যে একজনকে শিক্ষিত লোকে কেন যে সুখ্যাতি করে, তা বুঝি না!"

"আমি জানি, পাড়াগাঁয়ের কত দীন-দুঃখী লোক দিন-রাত প্রাণপণ-পরিশ্রম করে নিজের বিধবা ভাদর্ বউ, নাবালক ভাইপো, ভাগ্নাদের মানুষ করে। তারা ভাবে এ তাদের ধর্ম্ম,—করতেই হবে,—না করলে মহাপাপ! আর গাঁয়ের কোন লোকই তার জন্যে তাদের তো বাহবা দেয় না? যেহেতু তাদেরও সেই বিশ্বাস দৃঢ় আছে। কিন্তু শিক্ষিত সভ্য লোকের এ মতি হয় কোথা থেকে?

"আমরা, 'দেশে শিক্ষা বিস্তার হউক, শিক্ষা বিস্তার হউক'—ক'রে, চেঁচাচ্ছি; কিন্তু যে শিক্ষার পরিণাম এই, ভগবান্ করুন সে শিক্ষা, সে ভদ্রতা, দেশের লোককে যেন শিখতে না হয়!

"এখন দেখি, যেটা না করা অন্যায়, পাপ—সেটাও যদি কেউ করে, তাতেও অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক অবাক হয়ে যায়, ভেবে—'যে, সে যেন একটা কি অলৌকিক কাজ করলে।'

"এই সংপ্রতি যা হোল, তার কথা বলি। হাইকোর্টের একজন

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ব্যারিষ্টার—সি, আর, দাশ,—তুমি বুঝ্বে, বোমার মোকর্দ্দমায় অরবিন্দকে যে ডিফেন্স্ করেছিল,—সেই চিত্তরঞ্জন একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, অনেক পয়সাও রোজগার করে! তাঁর বাপ অনেক টাকা দেনা ক'রে পরিশোধ করতে না পেরে শেষে ইন্‌সল্‌ভেন্‌সি নিয়ে মারা যান। সি, আর্, দাশ বাপের সেই দেনা এই সে দিন পরিশোধ করেছে।

"জুয়াচুরি, অধর্ম্ম, মহাপাপ না করে", ছেলের যা প্রকৃত কর্ত্তব্য, যথার্থ ধর্ম্ম,—পিতৃঋণ পরিশোধ করা, তাই সে ক'রলো। তাতে অনেক শিক্ষিত লোক অবাক্ হয়ে গেল।

"অবশ্য সি, আর, দাশ এ করতে আইনতঃ বাধ্য ছিল না। কিন্তু কাল যদি কল্‌কাতার পুলীশ না রাখা হয়,—জেলখানা, পুলীশ, আদালত উঠিয়ে দেওয়া হয়,—তাহলে সব ভদ্রলোকদের কি চুরি কর্‌তে যেতে হবে? আর তা কেউ না গেলেই শিক্ষিত বাবুরা তাদের ধন্য, ধন্য করিবে? আমাদের শিক্ষার পরিণাম কি শেষে এই দাঁড়াচ্ছে?

"আমি জানি, তোড়কণায় এক বাগ্দী একশ টাকা ঋণ করে মরে যায়। পাড়া-গাঁয়ে যেমন ধার নেয়,—ওর কোনও লেখা-পড়া ছিল না। তার নাবালক ছেলে বড় হয়ে নিজের জোত্, লাঙ্গল, গরু বিক্রী ক'রে তার বাপের ঋণ শুধেছিল। সে এ ঋণ না শুধ্‌লে আইনে তার কিছুই হতো না; কিন্তু বাপের ঋণ না শোধ করা মহাপাপ, এ জ্ঞান তার টন্‌টনে ছিল। তাই সে সর্ব্বস্ব বেচে এ কাজ করেছিল।

"একজন অশিক্ষিত, দরিদ্র লোক স্বেচ্ছায় বাপের ঋণ শু'ধে যদি নিঃস্ব হতে পারে, তখন একজন শিক্ষিত, সভ্য পয়সাওয়ালা লোকের পক্ষে সে কাজ করা তো কিছুই নয়? কিন্তু আমাদের অনেক শিক্ষিত, সভ্য লোকদের দিন দিন যে মতি-গতি হচ্ছে, এ সব হিন্দুয়ানিতে তারা আশ্চর্য্য বোধ করে!

"পূর্ব্বে গাছ-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, এ গুলাকে হিন্দুরা মহা পুণ্য কাজ বলে জান্‌ত। এখন আর সে সব নাই। তার বদলে হয়েছে, 'অমুকের দুটা ঘোড়ার গাড়ী, আমাকে তিনটা রাখতে হবে; নয় ত মান যাবে।' দেনায় আকণ্ঠ ডুবে আছে, তবুও এয়ার, বন্ধু, সাহেব, মেম্ নিমন্ত্রণ করে হোটেলে খানা দিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করা চাই; নয়ত মানে খাটো হ'য়ে যাবে। আর ও-দিকে একটু ভাল জল না খেতে পেয়ে পাড়া-গাঁয়ে তাদের গরীব আত্মীয়, স্বজন, শত শত দীন দুঃখী নানা রকম রোগে ভুগে মারা যাচ্ছে!

"দেশের সমাজ-সংস্কারকরা,—'বাল্য বিয়ে না তুলে দিলে সুস্থ ছেলেমেয়ে হবে না,—হিন্দুর অকাল মরণ ঘুচ্‌বে না,—হিন্দুর বিধবার বিয়ে না দিলে, হিন্দু জাত্ লোপ পেয়ে যাবে'—বলে চেঁচাচ্ছেন। কিন্তু যারা আছে, তারা যে এক মুটা ভাতের, একটু ভাল জলের অভাবে মরে কুড় হ'য়ে যাচ্ছে; তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থার দিকে তো তেমন কারও নজর নাই!

"এক একটা হুজুগ করে কত টাকা চাঁদা তোলা হচ্ছে; কিন্তু

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

চার পাঁচ শত টাকা খরচ করলে পাড়া-গাঁয়ে একটা করে পুকুর কাটান হয়; কত লোক তাতে রক্ষা পেয়ে যায়।

"জলদান এত পবিত্র হিন্দুয়ানী ;—কেন এ সব হিন্দুয়ানী হিন্দু সমাজ থেকে চলে যাচ্ছে? যারা বলে ইংরাজি শিক্ষার ফলে এ সব হচ্ছে, তারা ভুল বলে! কই, ইংরাজের দেশে কিছুর অভাবে বছর বছর এতগুলা করে লোক মরুক দেখি! তখনই দেশশুদ্ধ লোক আহার নিদ্রা ছেড়ে জাত ভাইদের সে অভাব ঘুচিয়ে তবে তাদের অপর কাজ।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে দাদা সময় সময় যে মত প্রকাশ করিতেন, এবার সেই সকল কথা বলিব। হিন্দু-কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—"বাঙ্গালীর মেয়ের বড় বয়সে বিয়ে দেওয়াটা আমার কেমন মনে ধরে না। একটা ধেড়ে মেয়েকে সংসারে নিয়ে এলে স্বামীর সঙ্গে হয়ত তার মনের মিল হ'তে পারে; কিন্তু জা, ননদ্, শাশুড়ি, এরকম সব আত্মীয়াদের সঙ্গে তার কি তেমন মনের মিল হয়?

"দু চার জনের হয় ত হ'তে পারে, কিন্তু অধিকাংশেরই যে হয় না, তা নিশ্চয়। সে কেবল আপনার গণ্ডাটি বুঝ্‌বে! কিন্তু একটি ছোট মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলে, সংসারের সকলেরই তার প্রতি একটা বাৎসল্য ভাব এসে পড়ে; সেও সকলের আদর যত্ন পেয়ে অল্প দিনেই তাদের বশীভূত হয়ে পড়ে। এ রকম হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে তাতেও দু চা'টা বিগ্‌ড়াতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগই ভাল দাঁড়ায়।

"তবে এ রকম বিয়েতে যে বিপদ আছে, অভিভাবকদের সেদিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। মানে, ছোট মেয়ে ঘরে এনে তাকে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে দেওয়া যেন কোন রকমেই না হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

"আমি জানি, পাঞ্জাবে ও রাজপুতানায় অনেক বড় বড় ঘরে এ রকম প্রথা আছে যে, নয় দশ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ষোল সতর বৎসরের ছেলের বিয়ে হয়। ছেলে, মেয়ে এক বাড়ীতেই থাকে; কিন্তু উভয়েই পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে স্বামী-স্ত্রীর মত থাকতে পায় না। বেশ সুন্দর প্রথা। আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারকরা বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে এ রকম ব্যবস্থা ক'রতে পারে না?

"এখন শুনি, নয় দশ বৎসরের মেয়ের পাত্র খুঁজতে খুঁজতে প্রায় চৌদ্দ পোনের বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়; আবার এখন অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রলোকে ছেলের লেখা-পড়া শেখান এক রকম শেষ না করে বিয়ে দিতে চান না। দশ এগার বৎসরের বৌ ঘরে এনে তাকে স্বামী সহবাস করতে দেওয়ার চেয়ে এ রকম ব্যবস্থা সহস্র গুণে ভাল।"

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"বিধবা বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলে যাঁরা হিন্দুর বিধবা বিয়ে সমাজে চালাতে অমত করছেন, তাঁদের আমি কোনও অন্যায় দেখি না। আর যাঁরা বিধবা বিবাহ চালাতে ইচ্ছুক, তাঁদেরও আমি কোন দোষ দি না। কিন্তু এটাও একবার ভাল করে ভেবে দেখা উচিত—আমাদের সমাজে এখন যেরূপ সাংসারিক অবস্থা, তাতে প্রথম একবার মেয়ের বিয়ে দিতেই বাপকে প্রাণান্ত হ'তে হয়। এইত সেদিন বাপ, মেয়ের বিয়ে দিতে না পারায়, তাঁর কষ্ট বুঝে মেয়েটা পুড়ে মরলো।* তার

---

* স্নেহলতা

উপর যদি আবার দুই চারটা বিধবা মেয়ের দুই একবার করে বিয়ে দিতে হয়, তা হলে বাপদের অবস্থা যে কি হবে, ভেবে পাওয়া যায় না। অবশ্য আমি মধ্যবিত্ত সাধারণ গৃহস্থের কথা বল্‌ছি। বিধবা বিয়ে প্রচলন না হওয়ায় বাপেরা সেটা হ'তে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে।

"হিন্দু বিধবা মেয়েদেরও মনে একটা বেশ সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে, 'বিধবার আবার বিয়ে করায় মহা পাপ।' কিন্তু মনে কর বিধবা বিয়ে হিন্দু সমাজে যদি খুব চলে যায়, তাহলে ক্রমে ক্রমে হিন্দু বিধবাদের মন হ'তে এ সংস্কারটাও লোপ পেয়ে যাবে। তখন তারা দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্য বিশেষ দাবী করবেই করবে। (এ কিছু মাত্র আশ্চর্য্য ভেবো না। যে রকম দেশের হাওয়া বদ্‌লাচ্ছে, আমি তাই ভেবে বল্‌ছি।) তখন বাপদের উপায় কি হবে?— তাতে সংসারে যে অশান্তি আসবে, তার বিষময় ফল বড় বিষম হবে!

"অনেকে বলে—'বিধবা বিয়ে না দেওয়ায় দেশে ব্যভিচার বাড়ছে।' কিন্তু বিধবা বিয়ে খুব চ'লে গেলে তখন, 'বিধবার বিয়ে করা মহা পাপ,' এ ধারণাটাও বিধবা মেয়ের মন হতে যাবে; তারপর অর্থাভাবে বাবারা তাদের বিয়ে দিতে না পারলে ব্যভিচার তো আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। এখন সমাজ-বন্ধন, ধর্ম্ম-ভয়টায় যে অনেক রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে।

"আমাদের সমাজ-সংস্কারকরা হিন্দুর সব প্রথাই ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। স্ত্রী-পুরুষের মন হ'তে যদি সেই ধর্ম্ম-ভাবটাই খসে পড়ে, তাহলে মেয়েদের বাল্য বিয়েই দাও বা যৌবন

বিয়েই দাও, বিধবা বিয়ে চলুক বা না চলুক, হিন্দু সমাজের সুখ শান্তি কিছুতেই হবে না। আমি তাই ভাবি,—বিধবা বিয়ে হিন্দু সমাজে এখন যেমন আছে তেমনই থাকুক।' পরে যখন আমাদের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল হবে, পণপ্রথা উঠে যাবে,—তখন হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ চলে তো চলবে।

"তবে এও বলি, সংস্কারকেরা যত চেষ্টাই করুক, হিন্দুর বিধবা বিয়ে সমাজে যে শীঘ্র বেশী চল্‌বে, তা মনে হয় না। বিধবা বিয়ে না হওয়া প্রথাটা হিন্দু সমাজে এমন শিকড় গেড়েছে, যে, তাকে ফস্ করে তুলে ফেলা সহজ কাজ নয়।

"আমার মত, এখন বিধবার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার চাইতে সুশিক্ষা দিয়ে তাদের মনে যাতে প্রবল ধর্ম্ম-ভাব জাগিয়ে তুলা যায়, যত শীঘ্র সম্ভব সর্ব্বাগ্রে সকলের সেই চেষ্টা করা উচিত। এতে সুফলের আশা বেশী।"

"অনেকে বলে শুনি, 'বাজারে এমন সব কুৎসিত নভেল্ লেখা বের হতে আরম্ভ হয়েছে, যে, তাতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখান বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' যদি এ সত্য হয়, তবে এ একটা মহা মুস্কীলের কথা বটে! এমন কেন হয়? যখন একটা জাতির অধোগতি হতে আরম্ভ হয়, তখন নানা দিক্ হ'তে তার আপদ্ এসে জুটে।

"আমাদের দেশে আগে পাড়াগাঁয়ে যে কথকতা হতো, তাতে অনেক মঙ্গল হতো। ইতর ভদ্র সকলের মনে সর্ব্বদা একটা ধর্ম্মভাব জাগিয়ে রাখা যেত। সেটা সমাজের পক্ষে কম লাভ

ছিল না। এখন সে সব গিয়ে, গাঁয়ে গাঁয়ে বকাটে ছেলের দল থিয়েটার করা ধরেছে।"

সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"আমাদের সমাজে কতকগুলা প্রথা বেশ ভাল আছে। যেমন গুরুজন কি মাননীয় বয়োজ্যেষ্ঠ লোক কেউ এলে, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, কি ঐ রকম লোকের সাম্‌নে তামাকাদি না খাওয়া। এটা করা অতি সহজ, আর তাতে লোক কত খুসি হয়। কিন্তু দুঃখের কথা— সেগুলোও উঠে যাচ্ছে।

"এ সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলি,—একবার আমিই মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। মহারাজ জান্‌তেন,'আমি অনবরত তামাক খাই।' আমি মহারাজের কাছে যাবামাত্র তিনি আমাকে খুব আদর-যত্ন করে বসিয়েই চাকরকে ডেকে আমার জন্য আল্‌বোলা আন্‌তে বল্‌লেন। আমি তখন তাড়াতাড়ি তাতে বাধা দিয়ে বল্‌লাম—'না, আমি তামাক খাব না।'

"মহারাজ এতে ভাব্‌লেন—'তামাক ভাল হবে না বলেই বুঝি আমি খেতে চাচ্ছি না।' তাই তিনি বল্‌লেন—'না, না, আপনি দেখুন না, আমার অতি উৎকৃষ্ট তামাক আছে।' তখন আমি বল্‌লাম—'সেজন্য নয়। আমি আপনার মত লোকের সাম্‌নে তামাক খেতে পারি না।'

"মহারাজ এতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন—'আপনি বলেন কি? দু পাতা ইংরাজি পড়ে, এ পর্য্যন্ত কেউ তো আমার কাছে তামাক খেতে দ্বিধা করে নাই!'

পঞ্চদশ অধ্যায়

"এই বলে তিনি, প্রদ্যুত, প্রদ্যুত, করে প্রদ্যোতকুমারকে ডেকে বল্‌লেন—'দেখ প্রদ্যুত! রাসবিহারীবাবু আমার সাম্‌নে তামাক খেতে সঙ্কুচিত হচ্ছেন! প্রকৃত শিক্ষিত হলে লোক কিরূপ বিনয়ী হয়, তা আমি এত বয়সে রাসবিহারীবাবুর কাছ হতে তার সুন্দর দৃষ্টান্ত পেলাম!'

"দেখ, সামান্য ঘণ্টাখানেক তামাক খেলাম না বলে অমন একজন লোক কত খুসী হলো।"

"এই যে, কৃষ্ণকমল বাবু আমার কাছে এসে যতক্ষণ থাকেন, আমি তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকি, তাতে আমি কি কষ্ট পাই? আমার কি ক্ষতি হয়? অথচ অমন একজন মানী লোককে হিন্দুয়ানী মতে বেশ একটু সম্মান দেখান হয়।

"ইয়োরোপেও তো দেখেছ, আমাদের চাকর এক যায়গায় আমাদের কাছে বস্‌ত না বলে, সে দেশের লোকরা তার কারণ শুনে আমাদের এ সব হিন্দুয়ানী প্রথার কত সুখ্যাতি কর্‌ত। এখানকার অনেক সাহেবেও তা করে। কিন্তু আমরা আমাদের সে সুপ্রথাগুলো ছেড়ে দিচ্ছি।

"শুনি, এখন নবীন বাবুরা, গুরুজন বা মাননীয় লোকদের ভাল করে একটা প্রণাম কর্‌তেও রাজী নন। নিজের বুকের বা মুখের সাম্‌নে ডান্ হাতটা তুলে একটু নেড়ে দিয়ে সে কাজটা সারেন।"

হিন্দুর কুসংস্কার সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"আমি হিন্দুর প্রায় সব প্রথাই মাথা পেতে নিতে রাজী আছি, কেবল এর

কুসংস্কারগুলোর উপর আমার মর্ম্মান্তিক রাগ। কুসংস্কার মানুষকে পশুর অপেক্ষাও অধম করে। হিন্দু-সমাজে কুসংস্কারটা যেমন প্রবল, এমনটি আর কোন সমাজেও দেখা যায় না।

"একটা কাক বারকতক উপ্‌রি উপ্‌রি ডাকলে,—রাতে মাথার উপর দিয়ে একটা পেঁচা ডেকে উড়ে গেলে,—ঘরের মেজেতে উপর হ'তে একটা টিক্‌টিকি পড়্‌লে,—এমন কি মানুষ হাঁচ্‌লে, এ সবের প্রত্যেকটায় একটা না একটা বিপদ হয়; হিন্দুর এই বিশ্বাস। এমন অনেক আছে।

"নয় দশ বৎসরের একটা বিধবা মেয়ে—চৈত্র বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে একাদশীর দিন পিপাসায় যদি সে গলা শুকিয়ে মরেও যায়,—তবু তাকে একটু জল খেতে দিতে নিষেধ; এমন কি যে তাকে সেদিন জল দিবে তার চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে। এ রকম নিষ্ঠুর কুসংস্কার, যে বুনো লোকেরা মানুষ খায়, তাদের মধ্যেও নাই। আর এগুলো মেনে চলা, আমাদের স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে।

"এর একটা কথা বলি—'যে বৎসর আমি ইটালী বেড়াতে যাই, কল্‌কাতা হতে যেদিন আমি বার হব, সে দিনটা হিন্দু শাস্ত্রের সংস্কারমতে নাকি বড় খারাপ দিন ছিল। ইটালী যাবার আগের দিন যোগেশদের বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় যেমন প্রায় যেতাম তেম্‌নি গেছি। গুরুদাসবাবুর মত লোক হ'তে আরম্ভ করে আরও জনকতক বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত লোক আমায় বল্‌লেন—'আপনি কাল নাকি ইটালী যাবেন? এ কাজ কখনও কর্‌বেন

না। কাল্‌কার মত যাত্রার কুদিন প্রায় হয় না। ঐ দিন অগস্ত্য, ত্র্যস্পর্শ ও মঘা।' এই রকম কত বলে বল্লেন…'এ রকম দিনে যাত্রায় বিপদ নিশ্চয়!'

"আমি তোমাদের পর্য্যন্ত এ সব কথা কিছু বলি নাই—পাছে তোমরা কিছু মনে কর। সেই দিনই আমি তো ইটালী গেলাম। যেমন বেরিয়েছিলাম তার চেয়ে বরং হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ফিরে এলাম। এতদিনে কোথাও একেবারে একটা হোঁচোট্ পর্য্যন্ত খাই নাই। ইটালী হতে ফিরে এসে গুরুদাসবাবুকে আর অন্যকেও এ কথাটা বলেছিলাম।"

"আর একটা ঘটনার কথা বলি—'বাবার নামে স্কুল আর ঠাকুমার নামে পুকুর প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যখন তোড়কণায় গিয়েছিলাম, স্কুল ও পুকুর প্রতিষ্ঠার কাজ হয়ে যাবার পর দু' তিনজনের সঙ্গে একদিন একটা বোটে করে, ঠাকুমার পুকুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় একটা মাছ লাফিয়ে নৌকার উপরে পড়্‌ল।

"আমার তখনই কেমন মনে হোল, ছেলেবেলায় একদিন মাছের লেজা খেতে না পেয়ে জলে ডুবে মর্‌তে গেছিলাম। ঠাকুর-মা তার জন্য কত কান্নাকাটি করেছিলেন। আজ কি তাই, ঠাকুমার নামে পুকুর প্রতিষ্ঠা কর্‌লাম বলে, ঠাকুমা তাঁর পুকুরের এ মাছটা আমায় খেতে দিলেন?

"কুসংস্কার হিসাবে ভাব্‌লে আমার তখন যা মনে হয়েছিল, এ তো ঠিক্‌ই তাই, কোনও গোল নাই! কিন্তু নৌকাতে, পুকুরের পাড়ে, মানুষের গায়ে, অমন কত মাছ লাফিয়ে পড়্‌ছে। আমার

নৌকাতে মাছ লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে পূর্ব্বের একটা ঘটনার দৈবাৎ একটু মিল হোল বলে, 'ঠাকুমা আমায় মাছ খেতে দিয়েছেন' মনে নিশ্চয় ক'রে লওয়া কত বোকামির কাজ? কিন্তু আমাদের সমাজে শতকরা নিরানব্বই জন এইরূপ করে থাকে। তাই আমার খুব ইচ্ছা আছে, 'মিলের লজিক্' বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করে ছেলেদের পড়্তে দিব।"

ষোড়শ অধ্যায়

হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"গরু খাওয়া, গোহত্যা করা মহাপাপ, এ বিশ্বাস যতকাল হিন্দুর মন হ'তে না যাবে, বা মুসলমান যতদিন গোহত্যা, গরু খাওয়া না ছাড়বে, ততকাল এ উভয় জাতির পরস্পর মিলন কি করে সম্ভব হবে, বুঝি না। কারণ ঐটাই এ দুজাতের মিলনের প্রধান বিঘ্ন।"

"সেদিন সাম্‌শুল হুদ্দা আমায় বল্‌ছিল—'আপনারা মুখে বলেন, হিন্দু-মুসলমানের মিলন হউক, কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানের সঙ্গে ভাল করে মিশ্‌তে সঙ্কুচিত হয়। এ বিষয়ে আমি নিজেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। অবশ্য আপনি সে রকম কিছু করেন না বটে ; কিন্তু গুরুদাস বাবুর সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড কর্‌তে হাত বাড়ালে তিনি নাছুই, নাছুই করে হাতটা একটু বাড়িয়েই সেলাম্-টেলাম্ করে সেরে দেন দেখি। আমি আমার সমাজের একজন তো রেস্‌পেক্‌ট্‌বল্ মানুষ, আমার সঙ্গেই যদি একজন শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক ওরকম ব্যবহার করেন, তখন অন্যের কথা আর কি বল্‌ব বলুন ?'

"আমি তাতে হুদ্দাকে বল্‌লাম—'তুমি আমার কথা যা বল্‌ছ, আমি হিন্দুয়ানী কর্‌লেও আমার গোঁড়ামি হিন্দুয়ানী নাই। তবে তোমার সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করে আমি হাত ধোব ; সে আমি আমার

বাপের সঙ্গেও সেক্‌হ্যাণ্ড করলে তাই করব। ওটা আমার অভ্যাস। হয়ত ইংরাজি না পড়লে আমার শুচি-বাই রোগ হতো।

"তবে গুরুদাসবাবু গোঁড়া হিন্দু, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তিনি যে তোমার হাত ছুঁয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড করতে একটু ইতস্ততঃ করেন, তার কারণ এ নয় যে, তুমি বিধর্ম্মী মুসলমান বলে তোমার প্রতি ঘৃণাবশতঃ তিনি ওরূপ করেন। তবে হিন্দুমাত্রেই গরু মারা, গরু খাওয়াটা মহাপাপ বলে মনে করে। আর ওটা ওদের মজ্জাগত হ'য়ে গেছে; কাজেই যারা গরু মারে, গরু খায়, হিন্দুর মতে তারা মহাপাপ করে। গরু মারা, গরু খাওয়াটা তোমাদের সমাজে প্রচলিত আছে বলে, তোমাদের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব থাকা হিন্দুর পক্ষে স্বাভাবিক।

"যদি কোনও শুয়ারখোর জাত কোনও গোঁড়া মুসলমানের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করতে যায়, তবে সে মুসলমান কি শুয়ারখোরকে ছুঁতে ইতস্ততঃ করবে না? তোমাদের প্রতি হিন্দুদের ওরূপ ব্যবহারটা কেবল গরু খাওয়ার জন্য। অন্য আর কিছু নয়; তুমি নিশ্চয় জেন!

"গুরুদাসবাবু যদি জানেন—'তুমি জাতিতে মুসলমান, কিন্তু গরু খাওয়া ঘৃণা কর, জীবনে কখনও গরু খাও নাই, তাহলে তিনি একজন ব্রাহ্মণকেও যেমন ছুঁতে সঙ্কুচিত হন না, তোমাকেও ঠিক্ সেইমত করতেন।

আমি এর দৃষ্টান্ত জানি। আমাদের দেশের পাড়াগাঁয়ের মুসলমানরা গরু কাটেও না, খায়ও না। 'হতে পারে পয়সার

অভাবে!' কিন্তু সে জন্য সেখানের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এমন 'নাছুঁই নাছুঁই' ভাব নাই। তারা স্বজাতিরই মত পরস্পর মেলা-মেশা করে থাকে। পরস্পরে চাচা, নানা, ভাই, দাদা সম্পর্কও পাতায়।

"আমি তোমাকে ঠিক্ বলে দিতে পারি; হিন্দু মুসলমানে পরস্পর ভাইয়ে ভাইয়ের মত মিল হয়ে যায়, যদি তোমরা গরু খাওয়াটা ছাড়।

"কোনও হিন্দুর ছেলে যদি গরু খেতে আরম্ভ করে, তাহলে তার মা বাপ এক জন মুসলমানকে যা ঘৃণা না করে, তার নিজের ছেলেকে তার অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী ঘৃণা করবে। ছেলেকে হয়ত ত্যাজ্যপুত্র ক'রে ঘর থেকে দূর ক'রে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তবে ক্ষান্ত হবে।'

"হুদ্দা তখন আমায় বল্‌লে—'কিন্তু হিন্দুরা সাহেবদের বেলায় তো ওরকম ছুঁই, ছুঁই করে না?'

"আমি তাতে বল্‌লাম—'নিশ্চয় করে! তবে তারা পর, তোমরা যে আমাদের প্রতিবাসী, নিজজন আত্মীয়ের মত। আত্মীয়ের, নিজজনের প্রতিবাসীর অন্যায় যে সহ্য হয় না, কাজেই পরের চেয়ে তোমাদের উপর রাগটা বেশী হয়।

"ভেবে দেখ না? তোমার ঘরের কেউ একটা অন্যায় কাজ করলে, তুমি যে রকম রাগ্‌বে, বাইরের পর একটা কেউ তা কর্‌লে তোমার কি সেরকম রাগ হবে? নিজজন, আত্মীয়, প্রতিবাসীর উপর স্নেহ, ভালবাসাটা যেমন পরের চেয়ে বেশী

থাকে, তাদের অন্যায়ে রাগটাও তাদের উপর পরের চেয়ে বেশী হয়। এ ত স্বাভাবিক।

"তোমরা এতকাল হিন্দুর সঙ্গে মেলা-মেশা, পাশা-পাশি হয়ে থেকেও, তারা যেটাকে অতি পাপ, অতি ঘৃণিত কাজ বলে মনে করে, সেটা কর্‌তেও ছাড় না। কাজেই তোমাদের উপর তাদের বেশী রাগ হয়।'

"তাতে হুদ্দা আমায় বল্‌লে—'আপনি তো বেশ প্রাণ জুড়ান কথা বল্‌লেন।' তখন আমি তাকে স্পষ্টই বল্‌লাম—'দেখ হুদ্দা, তুমি আমার বন্ধু, তোমায় যা আমি এখন বল্‌লাম, এর মধ্যে ওকালতি চা'ল্ আছে এ যেন তুমি মনে কর না। তুমিও ভেবে দেখ না, হিন্দু মুসলমান মিলনে যে উভয়েরই অশেষ সুবিধা আছে, তাতে কিছুমাত্র ভুল নাই।'

তখন হুদ্দা বল্‌লে—'না, না, তা কেন ভাব্‌ব। বুঝি সবই, আপনি যা বল্‌লেন—খুবই ঠিক্!'

"হুদ্দা লোক ভাল! তার একটা মজার কথা বলি—আমি একটা মোকর্দ্দমায় বর্দ্ধমান গিয়েছিলাম। হুদ্দা বিপক্ষের হয়ে গিয়েছিল। হুদ্দার সওয়াল্ জবাবের পর আমার সওয়াল্ জবাব করা হ'লে, হুদ্দা জবাব দিতে উঠেই জজ্‌কে বল্‌লে—'রাসবিহারীবাবু জজ্‌দের যা-তা বুঝিয়ে দেন। এ মোকর্দ্দমায় ওপক্ষে জিতবার কিছুই নাই, এক রাসবিহারী বাবু ওদের উকিল আছেন, এতেই যদি জিতে।'

"তাতে তখন আমার বড় রাগ হয়েছিল। রেলে ফিরবার

সময় হুদ্দাকে বল্‌লাম—'তুমি যে জজ্‌কে বল্‌লে, 'রাসবিহারী বাবু জজ্‌দের যা-তা বুঝিয়ে দেয়,' এতে তোমার কেশ্‌ তো আরও খারাপ হ'বে; কারণ, ওদের 'হাম্‌বড়িয়াত্ব' তো আছে? ও তোমার কথায় তো চটে যেতে পারে এই ভেবে যে, তুমি তাকে খুব বোকা ভেবেছ, সে আইন-কানুন কিছুই জানে না, আমি তাকে যা-তা' বুঝিয়ে দেব। আর সেই রাগেই তো ও তোমাকে মোকর্দ্দমায় হারিয়ে দিতে পারে?'

"তায় হুদ্দা বল্‌লে—'আর কি করি? কারে পড়্‌লে সবই কর্‌তে হয়। কাগজ পড়ে ভেবেছিলাম, আমার মোকর্দ্দমায় খুব জোর; কিন্তু আপনি যা সওয়াল্‌ জবাব কর্‌লেন, তার উত্তরে ও ছাড়া আর কি বলি বলুন? কিন্তু জজটা তো আমার কথায় বিশ্বাস করে, 'রাসবিহারীর দ্বারা আর কেন বোকা বনি'—ভেবে আমায় ত জেতাতে পারে? এই বলে হুদ্দা খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"হুদ্দা এই মোকর্দ্দমাটা জিৎতে যে চালাকি খেলেছিল, আমি একবার কতকটা এই রকম চালাকি করে একটা বড় মোকর্দ্দমা জিতেছিলাম।

"তার গল্পটী বলি—'ছাপরায় একটা মোকর্দ্দমায় গিয়েছিলাম। জজের কাছে প্রায় তিন কোয়াটার সওয়াল্‌ জবাব করেছি। তখন জজ্‌ সাহেব কপাল কুঁচ্‌কে, মুখ বিকৃত করে আমায় ব'লে বস্‌লেন—'তুমি যে এতক্ষণ ধরে কি বল্‌ছ তা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।'

"এ শুনে রাগে আমার পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে গেল।

কিন্তু মক্কেল্ অনেক পয়সা দিয়ে তার কাজের জন্য আমায় এখানে নিয়ে এসেছে ভেবে, আমি রাগটা খুব কষ্টে সহ্য করে নিলাম।

"জজ্‌টাকে কিছুই বলিলাম না। মনে মনে ভাব্‌লাম, 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে, ভাঙ্গে হীরের ধার।' কথাটা কি আজ আমার ভাগ্যেই খেটে গেল? এত কষ্ট করে মোকর্দ্দমাটার জন্য যে আমি আইন্-টাইন্ দেখে খাটুলাম, সবই কি বৃথায় গেল!

"আমার আইনের বিদ্যেতে এর কাছে কিছু ফল হবে না বুঝে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তার পর আস্তে আস্তে জজ্‌কে বল্‌লাম—'আমি এতক্ষণ ধরে যা সওয়াল্ জবাব কর্‌লাম, তার কিছুই কি আপনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? আমি আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে কল্‌কাতা হাইকোর্টে ওকালতি ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু সেখানকার কোন জজ্‌ই কখনও আমাকে এ কথা বলেন নাই যে, তাঁরা আমার সওয়াল্ জবাব বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না। আর এতদিন আমারও একটা ধারণা ছিল যে, অন্য আর কিছু তেমন না জান্‌লেও আমি মোকর্দ্দমার বিষয়টা জজ্‌দের ভালরকম করে বুঝাতে পারি। কিন্তু এখানে আজ যে এমন কেন হ'ল, কিছুই ঠিক্ করতে পার্‌ছি না।

"তবে বোধ হয় এই ছাপ্‌রার আব্‌হাওয়াটার জন্যই এমন হল, এরকম আবহাওয়ায় আপনাদের মত লোকের মাথা কখনই ঠিক্ থাক্‌তে পারে না। কল্‌কাতা এখানকার অপেক্ষা অনেক ভাল। সেখানকার জলবায়ু অনেকটা ঠাণ্ডা। সেজন্য সেখানে জজেরা অনেকটা মাথা স্থির রেখে কাজ কর্‌তে পারে। আপনি যখন

কল্‌কাতার হাইকোর্টে যাবেন, তখন বুঝ্‌বেন, আমার এ কথা ঠিক কি না।”

“এই বলায় সাহেব বুঝে নিলেন যে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে, তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে জজ্‌ হবার একজন উপযুক্ত লোক এবং নিশ্চয় শীঘ্রই তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে জজ হবেন।

“তখন সাহেবের কপাল কুঁচ্‌কান গেল। একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—‘হাঁ, এসব জায়গার চেয়ে Gangetic valley’ কতকটা আরামপ্রদ বটে।’ তার পর বল্‌লেন—‘তুমি সওয়াল্‌ জবাব কর।’ তখন আমি সওয়াল্‌ জবাবে আইন্‌-টাইন্‌এর দিক দিয়েও গেলাম না। কেবল মাঝে মাঝে বল্‌তে লাগ্‌লাম, আপনার মত বিচক্ষণ জজের কাছে এ মোকৰ্দ্দমাটী হচ্ছে বলেই এর ন্যায় বিচার হবে। অন্যে এ মোকৰ্দ্দমার বিষয় কিছুই বুঝতেই পারত না।’

“সাহেব তখন খুব গম্ভীর হয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন—‘তাই দেখ্‌ছি, মোকৰ্দ্দমাটা খুব জটিল বটে।’

“তার পর যখন সেই মোকৰ্দ্দমার রায় পড়লাম, তখন আর হেসে বাঁচি না। যাঁরা আইনের ক, খ, টুকু জানেন, তাঁরাও সেই মোকৰ্দ্দমায় যে সব pointএ জেতান যেতে পারে না বুঝেন, ছাপ্‌ড়ার জজ্‌ সাহেব সে সব pointএও জিতিয়ে দিয়েছেন।

“হাইকোর্টে আপিলে সে মোকৰ্দ্দমাটী জেন্‌কিন্‌স্‌ এর কাছে হয়েছিল। জেন্‌কিন্‌স আমায় বল্‌লে—‘তুমি কি এই লোকটাকে যাদু করেছিলে? এ করেছে কি?’

“আমি বলেছিলাম—‘আমার ওকালতি বিদ্যে ওর কাছে

খাটে নাই। তাই দায়ে পড়ে অন্য বিদ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।' তারপর জেন্‌কিন্‌সকে ছাপ্‌ড়ার ঘটনার গল্পটা বল্‌তে, সে খানিকটা হেসে আমায় একটু ঠাট্টা করে বল্‌লে—'অনেক রকম বিদ্যে একজায়গায় জুটে তবে একজন 'Dr. Ghosh' হয়েছেন দেখ্‌ছি?"

সপ্তদশ অধ্যায়

ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে দাদা বলিতেন "যে, সকল সভ্য জাতি মাত্রেরই ধর্ম্ম ভাল। দেশ ভেদে আচার বিচার ও খাদ্যের বিভিন্নতা থাকিলেও, সকল ধর্ম্মোপদেষ্টারাই মানুষকে শিক্ষিত, সভ্য হইবার ও সুখস্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবার জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলই প্রায় একরূপ।

"শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, বুদ্ধ, যিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্যদেব ইঁহারাও সকলে প্রায় তাহাই বলিয়াছেন। তবে মহম্মদ ধর্ম্মের সহিত তরবারি চালাইবার যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেটা ভাবিলে শরীর মন শিহরিয়া উঠে। তবে আমাদের এই পরাধীনতার দুর্গতি দেখিয়া মনে হয়, মহম্মদ ঠিক্‌ই করিয়াছেন। পরের লাথি, জুতা খাইতে খাইতে যদি জীবনটা যায় তবে লোকে ধর্ম্মে, কর্ম্মে মন দিইবে কি করিয়া ?

"জগতে আমাদের আশে-পাশের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমরা বেশী অগ্রে সভ্য হইয়া পড়িয়াই আমাদের এত দুর্গতি হইয়াছে। চারিধারে হিংস্র লোকের মাঝে অহিংসুক হইয়া বসিয়া থাকিলে দুর্গতি হইবেই হইবে। ক্রাইস্‌ট্‌ অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁর চেলারা তাঁহার সে উপদেশ টুকু মানেই নাই।

"আমাদের ধর্ম্মোপদেষ্টাদের 'এ সংসার শুধু মায়া, আর অহিংসা

বার্ত্তাটাই' আমরা সকলের অপেক্ষা বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। সে কারণ হিন্দু ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতিরই হিংসা প্রবৃত্তিটা এত বেশী। দশ বৎসরের ছেলে হইতে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধের পর্য্যন্ত জীবহত্যাটা একটা যেন জীবনের আনন্দ।"

কিন্তু যে সাপের কামড়ে সদ্য-সদ্য মরণ নিশ্চয়, তাহাকেও হিন্দুদের মারিতে বারণ। ইহার জন্য আমাদের দুর্গতিও চরমে দাঁড়িয়েছে। এর আরও কিছু কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আসল কারণ যে ঐটা—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। তবে যদি ধর্ম্মের মধ্যে 'আদর্শ ধর্ম্ম কি ?'—বলিতে হয়, তাহা হইলে সে যে অহিংসা ধর্ম্ম, তাহাতে আর সংশয় নাই।

"মানুষ যখন প্রকৃত জ্ঞানের চরমসীমায় পৌছাইবে, তথন সকলকেই অহিংসা ধর্ম্মই মানিয়া লইতে হইবে," এই মন্তব্য তিনি প্রকাশ করিতেন।

আগ্রায় একজন সাধু প্রকৃতির মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'বাবু সাহেব, মুসলমানদের গরু মারার জন্য তাদের উপর হিন্দুরা যে এত চটা, তাতে হিন্দুদের কোনও দোষ নাই। গরু মানুষদের কত উপকারী জন্তু, আর তাকে মেরে খাওয়ার চেয়ে অধর্ম্ম দুনিয়ায় আর কি আছে, বাবু সাহেব ? খোদার সৃষ্ট একটি কীটও যেমন তাঁর কাছে আদরের, একটি মানুষও সেই রকম। তখন জাতিতে মুসলমান বলে, (ঈশ্বর-বিশ্বাসী) পরিচয় দিয়ে, আল্লার জীবকে খুন করে খাওয়া, তা কখনও হতেই পারে না। হিন্দুর ঠাকুরের কাছে পাঁটা কাটা, আর মুসলমানের ইদে

গরুকাটা, ঈশ্বরের নামে একটা ধর্ম্মের ছুতা করে সুখ করে পেট্ ভরান ছাড়া আর কিছুই নয় বাবু সাহেব!'

এই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন মুসলমানের উক্তি সম্বন্ধে দাদা বলিয়াছিলেন—"এ লোক আমার মন রাখ্‌বার জন্যেই হয় ত একথা বলে থাকবে। কিন্তু কথাটা যা বলেছিল, তা ঠিক্‌ই! তুমি যদি ঈশ্বরকে ভালবাস, ভক্তি কর, তাঁর আজ্ঞা পালন করতে ও বিশ্বাসী হতে চাও, তবে তোমাকে অহিংসুক হতেই হবে। কারণ এ কখনও হতেই পারে না যে, তুমি ঈশ্বরের কৃপা ও ভালবাসা পেতে চাও, অথচ আপনার স্বার্থের জন্য তাঁর সৃষ্টি নষ্ট করবে।

"ভগবান্ তাঁর সৃষ্টির মাঝে কৃপা করে মানুষকে জ্ঞান দিয়ে সকলের শ্রেষ্ঠ করেছেন। একটা বাঘ তার খাবার জন্য একটা জীব হত্যা করলে ঈশ্বর তাকে মাপ করবেন, কিন্তু জ্ঞানী মানুষ বাঘের মত অজ্ঞান পশু প্রকৃতির হয়ে যদি দুর্ব্বলকে হত্যা করে, পীড়ন করে, তাহলে ভগবান্ তাকে কখনই ক্ষমা করতে পারেন না।"

সাকার নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—"মানুষ ঈশ্বরকে সাকার ভাবেই পূজা করুক বা নিরাকার ভাবেই পূজা করুক, আমার বিশ্বাস, ফল সেই একই। ঈশ্বর যে কেবল একটা জায়গায় আছেন, তা নয়। তিনি সকল স্থানে সকলের মধ্যেই আছেন। একথা নিরাকারবাদীদেরও স্বীকার করতেই হবে। তখন সাকারবাদী যদি, 'এই পাথরটায় এই গাছটায়,

স্বধর্ম্ম ছেড়ে সেই সমাজে যায়, তাহলেও ত মহা ভুল করা হয়। কারণ হিন্দুর ঈশ্বর হিন্দুকে সৃজন করতে যে শক্তি মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়েছেন, মুসলমান বা খ্রীষ্টানের ঈশ্বর ঐ দুই জাতকে নির্ম্মাণ করতে তার অপেক্ষা কিছুমাত্রও বেশী শক্তি-মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুসম্বন্ধেও তাই। তখন লোকের নিজের নিজের ধর্ম্মে ও সমাজে আজীবন থাকা উচিত নয় কেন?

"মানুষের প্রকৃত সভ্য হতে এখনও যে কত বিলম্ব, তা এই ঈশ্বর নিয়ে তাদের পরস্পর রেষারেষি দেখে বেশ বুঝা যায়। আমি ভেবে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারি না, মানুষ এখনও কেন বুঝ্‌ল না যে, তাদের সকলেরই ঈশ্বর এক। না জানি সেদিনের এখনও কত বিলম্ব! যখন মানুষ মাত্রেই এটা বুঝবে, আর সেদিন একটা মহা মঙ্গলে জগৎ পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে বলে মনে হয়।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"ঈশ্বর আছেন কি নাই, এ সম্বন্ধে ঠিক করে কিছুই বলা চলে না। এ পর্য্যন্ত তা কেহ পারেনও নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে যা কিছু বলা কওয়া যায়, সবই কল্পনার উপর নির্ভর করে।

"নাস্তিকরা বলে—'ঈশ্বর যদি থাক্‌বেন, তবে জগতে এত দুঃখ কষ্ট কেন? আস্তিকরা যে বলে এ সব মানুষের কর্ম্মফল, তাই যদি হয়, তবে যে ঈশ্বরকে দয়াময়, জগৎ-পিতা, সর্ব্বশক্তিমান্ বলা হয়, তিনি তো ইচ্ছা কর্‌লেই এক মুহূর্ত্তে জীবের সেই কর্ম্মফলের মূল কারণ নষ্ট করে সকলকে সুখস্বচ্ছন্দে রাখতে পারেন?'

"মানুষ তার ছেলের বিপদ হ'লে তাকে রক্ষা কর্‌তে প্রাণপণ চেষ্টা করে, আর দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎ-পিতা এমন নিষ্ঠুর যে, তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট জীবের এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত হাহাকার তিনি ঘুচান না? তিনি তো ইচ্ছা মাত্র মানুষ যেমন স্বর্গের কল্পনা করে, জগৎকে সেই রকম স্বর্গ করে দিতে পারেন?'

"ঈশ্বর আছেন আর তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, দয়াময়, জগৎ-পিতা বলে মেনে নিলে নাস্তিকদের এ কথা যুক্তিযুক্ত বটে। কিন্তু আস্তিকরা এতে নানা তর্ক তুলে অনেক সময় বলে, 'একটা কচি

ছেলে তার প্রতি তার বাপ-মায়ের তিরস্কারের কারণ যেমন বুঝতে পারে না, মানুষেরও সেই রকম ঈশ্বরের এরূপ বিধানের কারণ বুঝ্‌বার সাধ্য নাই। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর জগতের জীবের প্রতি যে অসীম দয়া দেখান, সে তো বেশই প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌লেই মানুষকে দুঃখ কষ্ট পেতে হয়।'

"কিন্তু আস্তিকদের এ যুক্তিও সর্ব্বত্র সব সময় থাকে কই? কারণ অনেক সময় তো দেখা যায়, একজন প্রকৃত সাধু লোক জগতে অশেষ দুঃখ কষ্ট পায়, আর একটা অতি বদমাইস, পাপী লোক জগতে অশেষ সুখ স্বচ্ছন্দে কাটায়। তা হলে এ রকম হয় কেন?

"আস্তিক তখন ইহকালের সঙ্গে পরকাল এনে ফেলে কল্পনায় অনেক কথাই বলে। এমন কি তাতে ঈশ্বরের জেলখানা, পুলিশ কোর্ট, দারগা, জমাদারেরও অস্তিত্ব থাক্‌তে শুনা যায়।

"বুদ্ধদেবকে আত্মা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তিনি নীরব থাক্‌তেন। প্রকৃত জ্ঞানী, দেবতুল্য লোকের কাজই তো এই। মানুষের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা জন্মেছে, সেরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বের যখন প্রকৃত কিছুই প্রমাণ নাই, তখন সে বিষয়ে কোনও রকম মত প্রকাশ কর্‌তে গেলে মিথ্যা কথা বলা হয়। বুদ্ধদেবের পক্ষে তা কখনই সম্ভব হতে পারে না। তাই তিনি এ বিষয়ে নীরব থাক্‌তেন।

"একজন বড় ডাক্তারের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে মত্‌টা যেমন মেনে

লওয়া উচিত, সেইরূপ ঈশ্বর বিষয়ে মহাযোগী, মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেবের বিধানকে মান্য না করে আমি পারি না। তবে ঈশ্বরের থাকা না থাকার যখন তেমন যথার্থ কোনও প্রমাণ নাই, তখন মানুষ মাত্রেরই ঈশ্বর আছেন মনে করে, এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, পৃথিবীতে জীবন কাটান উচিত।

"একটা সুন্দর বিলাতী গল্প আছে। একজন বদ্‌মাইস্ লোক পাদ্‌রিদের জিজ্ঞাসা ক'রলো……'পিতা, আপনারা যে আহার নিদ্রা ছেড়ে দিনরাত এত কষ্ট করে মানুষের সেবা যত্ন করছেন, যদি ঈশ্বর বা পরকাল না থাকে, তবে তো সবই আপনাদের বৃথা হবে?'

"উত্তরে পাদ্‌রিরা বল্‌লেন…'এ রকম করায় আমরা বিশেষ কষ্ট বুঝি না। এ আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে; বরং একজনের কষ্ট ঘুচাতে পার্‌লে আমরা মনে সুখ পাই। তাতে ঈশ্বর বা পরকাল যদি থাকে, ভালই! এর জন্য তখন কিছু সুফল পেতে পারি। আর ও-সব কিছু না থাক্‌লে তাতে আমাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু তুমি যে পৃথিবীতে এসে এই সব অন্যায় কার্য্য করে বেড়াচ্ছ, যদি ঈশ্বর বা পরকাল থাকে, তা হলে তোমার দশা কি হবে, একবার ভেবে দেখ দেখি?'

শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর 'অমিয় নিমাই চরিতের' প্রথম তিন খণ্ড দাদাকে উপহার দিতে আসিয়া বলেন…'রাস-বিহারী, তুমি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছ জানি, তোমার মনে তেমন শান্তি নাই। তুমি ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনা কর, প্রাণে শান্তি পাবে। তোমার সব দুঃখ যাবে।'

তাহাতে দাদা বলিয়াছিলেন…'চিরদিন শ্রীচৈতন্যকে দেবতারই মত আমি শ্রদ্ধা ভক্তি করি, কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, এ আমি কি করে ভাবি? আপনিই বা এ কথা বল্‌ছেন কেন? আমার যেন মনে হয় চৈতন্যদেব নিজেই বলেছেন…'মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান মহাপাপ!' তার পর আমি চৈতন্যদেবকে এখন যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করি, আপনি যদি আমায় বুঝান, 'তিনি সত্যই ঈশ্বর' তাহলে সে রকম ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি আমার বোধ হয় থাক্‌বে না!'

এই কথা শুনিয়া শিশিরবাবু বলিলেন…'কেন?'

উত্তরে দাদা বলিলেন…'সাধারণ মানুষের তুলনায় চৈতন্যদেবের যে আধ্যাত্মিক শক্তি ও মাহাত্ম্যের জন্য আমি তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি, আমার ধারণারূপ ঈশ্বরের শক্তি-মাহাত্ম্যের তুলনায় সে কিছুই নয়। কিন্তু আপনি যদি আমায় চৈতন্য দেবকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস কর্‌তে কোনও রূপে বাধ্য করেন, তাহলে মহাপুরুষজ্ঞানে চৈতন্যদেবের প্রতি আমার যে ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, সে তো যাবেই। আর যে ঈশ্বরের শক্তি মানবশক্তিরই মত সীমাবদ্ধ, সে ঈশ্বরে যে আমার ভক্তি হবে না, এ তো স্বাভাবিক!

শ্রীচৈতন্য-প্রেমিক শিশিরবাবু তাঁহার এই উক্তিতে অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। দাদা তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার এ কথায় শিশির বাবু যেন কেমন এক রকম হয়ে পড়লেন। কিন্তু আমি তাঁকে যা বলেছিলাম, কতকটা ঠিক নয় কি? মানুষের কেমন একটা দুর্ব্বলতা যে, কোনও মানুষকে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী দেখ্‌লেই তাঁকে

হয় অবতার, নয় স্বয়ং ঈশ্বর বলে বসে। বিশেষ অবতারটার দেখি হিন্দুদের মধ্যেই বেশী ছড়াছড়ি। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে নয়। আমার বোধ হয় এটা হিন্দুদের মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতারই প্রমাণ।

"গীতাকারও বলেছেন...'জগতের হিতের জন্য ভগবান্ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন।' তুমি যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান ব'লে প্রকৃতই বিশ্বাস কর, তবে একথা বলা চলে না। জগতের হিত করতে ভগবানের মানুষের মত জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়ে পৃথিবীতে আস্‌বার কি দরকার? তিনি তো যেখানে আছেন, সেখান থেকেই পৃথিবীর হিত করতে পারেন। যখন তাঁকে ইচ্ছাময় বলা হয়, তখন তাঁর ইচ্ছাতেই তো সব হবে। কিন্তু এ সব নিয়ে তর্ক করে কাকেও পারবার যো নাই। কেউ যখন আর কিছুই পাবে না, তখন বলে বস্‌বে...'ঈশ্বর লীলাময়, তিনি লীলা কর্‌তে অবতার হন্।' এ কথার আর উত্তর নাই!

"পৃথিবীতে সকলেরই নিন্দুক আছে। যীশুখ্রীষ্ট,বুদ্ধদেব,এঁদেরও নিন্দুক ছিল। চৈতন্যদেবেরও নিন্দুক আছে। একদিন গুরুদাস বাবু, শিশির বাবুর ও তাঁর 'অমিয় নিমাই চরিতে'র খুব প্রশংসা করছিলেন। সেখানে আরও অনেক লোক ছিল। তার মধ্যে একজন তখন বলে উঠ্‌ল...'চৈতন্য দেবকে অবতার বা আর যার যা ইচ্ছা যায় বলুক, কিন্তু তাঁকে প্রেমময়, দয়াময়, এ বলা কারও কখন উচিত নয়।'

'একজন অতি দয়ামায়াহীন লোকও যে নিষ্ঠুরতা করতে পারে

না, চৈতন্য তা যেন খুব আহ্লাদের সহিত করেছিলেন—তাঁর অতি বৃদ্ধা জননী ও বালিকা স্ত্রীকে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয়ভেদী কান্নাকাটিতেও কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। যাঁদের দুঃখ দেখে তখন অপরেও কেঁদে আকুল হয়েছিল, তাতে গৌরাঙ্গের কিন্তু একটুও প্রাণ গলে নাই। যাঁকে প্রেমময়, দয়াময় বলা হয়, তাঁর এ কি রকম কাণ্ড?'

"এ নিয়ে তর্ক করে অনেকে অনেক কথা বল্‌লো। শেষে অবতার লীলার কথা পর্য্যন্তও উঠ্‌ল। আমি তখন বল্‌লাম... 'ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে সহজেই তো বেশ বুঝা যায় যে, তিনি প্রকৃত দয়াময়, করুণাময়ই ছিলেন। তা না হলে, এতকাল ধরে কোটী কোটী লোক তাঁকে দেবতা বলে পূজা করত না। যাঁর অসীম প্রেম, দয়া থাকে, তাঁর তুমি আমি সাধারণ মানুষের মত পৃথিবীতে আপন-পর জ্ঞান থাকে না। তিনি সকলকেই নিজের লোক বলে মনে করেন। তখন শত শত নিজজনের দুঃখ কষ্ট ঘুচাবার জন্য, পশু প্রকৃতির লোককে শিক্ষা দিয়ে সভ্য ভব্য মানুষের মত করবার ইচ্ছায় দুজনকে কিছু মনঃকষ্ট দিয়ে, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও গৃহ পরিবার ছেড়ে গিয়ে চৈতন্য দেব বেশী দয়ার, প্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন, না, নিজের মা'টিকে, স্ত্রীটিকে নিয়ে খুব আমোদ আহ্লাদে ঘরে বসে থাক্‌লে, প্রেমের বা দয়ার পরিচয় বেশী দিতেন?'

"দেখ, খুঁজলে কিছু না কিছু দোষ সকলেরই পাওয়া যায়। খণ্ডঘোষে আমাদের একজন খুব বুড়া আত্মীয় সর্ব্বদাই, 'কোথায়

কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ!' এই রকম কর্‌তেন। আমি তখন নয় দশ বৎসরের। একদিন তাঁকে বলেছিলাম...'আপনি অমন করে সর্ব্বদাই 'কোথায় কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলে ডাকেন কেন? সে তো অতি বদ্ লোক ছিল। মেয়েরা জলে নাইতে নাম্‌লে, সে তাদের কাপড় নিয়ে পালিয়ে মজা দেখ্‌ত।'

"তাতে সেই বুড়ো আমায় যা উত্তর দিয়েছিলেন, তেমন উত্তর আমি জীবনে আর শুনি নাই। তিনি আমায় বলেছিলেন···'বাবাজী, যা বল্‌লে, ঠিক্। আগে গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ কর দেখি, তার পর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ও কথা বল্‌বে!' বুড়া যা বলেছিল, একেবারে খাঁটি কথা। কারও গুণের সমকক্ষ হ'তে না পার্‌লে, তার একটু ত্রুটি সম্বন্ধে কথা বলা অতি নীচতা। মহাপুরুষদের বিষয়ে আলোচনা করবার সময় আমাদের অনেকের সেটা মনে থাকে না।"

ঊনবিংশ অধ্যায়

ছেলেদের শিক্ষার সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"মানুষ তো পশু। মানুষ, মানুষ নামের যোগ্য হয় বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা। মানুষকে সেই বিদ্যা শিক্ষা দিতে যিনি কিছু সহায়তা করেন, তাঁকে আমি ঈশ্বরের সমকক্ষ যদিও না ভাবতে পারি, তথাপি ঈশ্বরের পরেই যে তাঁর স্থান, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ', সে পিতা নয়, যে পিতা ছেলেকে লেখাপড়া শিখাতে প্রাণপণ যত্ন করেন না। কেবল জন্ম দেওয়া, আর পালন করা,—সে ত জীব মাত্রেরই প্রকৃতি। নীচ জানোয়ারেরাও জন্ম দেয়, আপনাদের বাচ্ছাকে খু যত্ন করেই লালন পালন করে। আমি যা বল্‌ছি, অনেক পই এ কথা শুন্‌লে আমায় গালি দিবে। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে এ কথা ঠিক্ কি না?

"একবার ইষ্ট্ বেঙ্গলে এক নাবালকের বিষয় কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্‌এর হাতে ছিল। গবর্ণমেণ্ট সেই নাবালক ছেলেকে.

ঊনবিংশ অধ্যায়

পশ্চিমের রাজ কলেজে পাঠাতে চাইলে, ছেলের বিধবা মা তাতে অরাজি হয়। সেই জন্য উকিল ব্যারিষ্টারের মত নিয়ে ম্যানেজার গবর্ণমেণ্টের কাছে একটা দরখাস্ত দেবে ভেবেছিল। ম্যানেজার এই উদ্দেশ্যে উডরফের, উডরফের ছেলের ও আমার মত নিতে এল। ভদ্রলোকটী বিধবা মুনীবের হয়ে অনেক কাঁদুনি গেয়ে বল্‌ল…'সাহেব ভেবে দেখুন, বাঙ্গালী হিন্দুর বিধবা মা ছেলে দূরে ছেড়ে দিয়ে কি করে থাকতে পারেন?'

"উডরফ অমনি খুব তেড়ে উঠে চেঁচিয়ে বল্‌লে…'তুমি এই মত নিতে আমাদের কাছে এসেছ? বাঙ্গালীই কি, ইয়োরোপীয়েন্‌ই কি, মা সবই সমান! সব মা'ই চায় যে, আপনার ছেলেটা কাছে থাকে! বাপ্‌ আছে, সে ভাবে তার ধর্ম্ম, ছেলেকে লেখাপড়া শেখান। তাই ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়। নয় ত পৃথিবীটা অসভ্য জানোয়ারের জায়গা হতো। তোমার মনীবকে বলগে, গবর্ণমেণ্ট তাঁর ছেলেকে লেখা পড়া শেখাবার জন্য ওখানে পাঠাতে চেয়ে খুব ভাল কাজই করেছেন। এতে যেন তিনি কোন রকম আপত্তি না করেন। নয়ত তাঁর ছেলে বদ্‌সঙ্গে মিশে মূর্খ হয়ে যখন বিষয় উড়াবে, তখন কি তিনি প্রাণে সুখ পাবেন?'

"উডরফ, উড্‌রফের ছেলের কাছে যখন এ কথা বল্‌ছিল, আমার বড় সুখ হচ্ছিল এই ভেবে যে, উডরফ এক রকম তো আমারই মনের কথা বল্‌ছে। আমি যখন এন্‌ট্র্যান্‌স্‌ পাশ করে

কল্‌কাতার কলেজে পড়তে এলাম, সেই সময় একবার মেদিনীপুর যাই। একরাত্রে বাবা কাজ কর্‌ছেন। আমি পাশের ঘর থেকে শুন্‌ছিলাম, 'মা, বাবাকে বল্‌ছেন···'তোমায় অনেক রাত জেগে কাজ কর্‌তে হয়,...একলা এত কাজ কর্‌তেও ত কষ্ট হচ্ছে; রাসবিহারী একটা পাশ করেছে, ইংরেজি শিখেছে, সে এখন এখানে থেকে তোমার সঙ্গে কাজ করলে তো তোমার অনেক আশান হয়?'

"বাবা সেই কথা শুনে একটু হেসে বল্‌লেন···'তা বটে, আমি অতটা ভাবি নাই। তোমার পরামর্শ মতই এখন কাজ করা হবে। তার আর কি?'

মায়ের এ কথা বাবাকে বল্‌বার কারণ, তাঁর তখন ইচ্ছা হয়েছে যে আমি একটি বিয়ে করে বৌ নিয়ে তাঁর কাছেই থাকি। বাবার ঐ কথায় মা ভেবেছিলেন, বুঝি সত্য সত্যই তাই হবে। পরদিন দেখি, মায়ের খুব স্ফূর্ত্তি। আমাকে বল্‌লেন···'তুই কাছা দিয়ে কাপড় পরতে জানিস না। তুই আবার সাহেবের কাছে পড়া বল্‌বি কি করে? এবার হতে এখানে থেকে ওঁর কাজ কর্ম্ম শেখ; উনিও তাই বলেছেন।' রাত্রে আমি ওঁদের যে সব কথা শুনেছিলাম, তা মনে হয়ে আমার তখন খুব হাসি পেয়েছিল।"

বর্দ্ধমান রাজপরিবার সম্বন্ধে দাদা বলেছিলেন—"ছেলেবেলায় বর্দ্ধমান রাজের স্কুলে অমনি পড়েছিলাম বলে আমি চিরদিন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। আমার বাবা যে আমাকে পয়সা

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর

পৃষ্ঠা—১৫৩

দিয়ে পড়াতে পারতেন না, তা নয়! কিন্তু মহারাজ তো আমাকে অমনি বিদ্যাদান করেছিলেন। তাই আমি ওঁদের দেবতার মত ভক্তি করি। কায়মনে বৰ্দ্ধমান-রাজের মঙ্গল চাই।

"বৰ্দ্ধমান রাজের ঘরাও বিবাদের সময় ওঁদের দুই পক্ষই তাঁদের উকিল থাক্‌বার জন্যে আমায় ধরেছিলেন। আমার তখন আয় এমন বেশী কিছু ছিল না। আমি সে সময় ওঁদের কোনও পক্ষের উকিল হ'লে, দু চার মাসেই ধনী হয়ে পড়তাম। কিন্তু আমি তাঁদের বলেছিলাম······'বৰ্দ্ধমান-রাজের ঘরাও বিবাদের জন্যে আমি বড়ই দুঃখিত। ছেলেবেলায় আমি মহারাজের স্কুলে অমনি পড়েছিলাম ; সেজন্য এ সময় আমি আপনাদের কোন পক্ষেই উকিল থাক্‌তে পারব না।'

"এই যে কয়েক দিন পূর্ব্বে কোনও একটা কাজে বৰ্দ্ধমান মহারাজ আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে প্রায়ই আমার বাড়ীতে আস্‌ছিলেন, তখন আমি বাড়ীর সকলকে বলে দিয়েছিলাম, মহারাজা আমার বাড়ীতে এসে যার সাম্‌নেই পড়ুন না কেন, সে যেন উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে—মহারাজকে ভক্তি ভাবে সম্বৰ্দ্ধনা করে।"

"অনেক রাজা, মহারাজা তো আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আমার বাড়ীতে আসেন। তাঁদের বেলায় তো বাড়ীর লোকদের এ রকম কর্‌তে বলি না? বৰ্দ্ধমানের মহারাজের বেলায় ও কথা বলি ; এর কারণ আমি তাঁর স্কুলে পড়েছিলাম। আর আমি যাঁকে

ভক্তি মান্য করি। আমার লোকদের তাঁকে সেইরূপ করা উচিত।"

"মধ্যবিত্ত বা গরীবের ছেলে অপেক্ষা ধনীর ছেলে যদি শিক্ষিত ও চরিত্রবান হয়, আমি তাহার সুখ্যাতি করার বিশেষ পক্ষপাতী। কারণ মধ্যবিত্ত বা গরীবের ছেলেরা পেটের জন্য লেখাপড়া করতে তো বাধ্য। অর্থের অভাবে তাদের বকামি করার পথ সঙ্কীর্ণ; তাতে বিঘ্নও নানা। কিন্তু ধনীর ছেলেরা, যাদের আশে পাশে সকল রকম বিলাসের সামগ্রীর ছড়া-ছড়ি, উচ্ছন্ন যাবার প্রশস্ত রাজপথ যাদের চারিধারে উন্মুক্ত, তারা যদি যত্ন-সহকারে লেখাপড়া শিখে চরিত্রবান হয়, তবে তারা যথার্থই প্রশংসার যোগ্য!

"আমি তার একটি দৃষ্টান্ত দি……নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র নাথকে। তিনি ধনী হয়েও কেমন সুশিক্ষিত, বিনয়ী, যথার্থ ভদ্রলোক। আমাদের বাঙ্গালীর আদর্শ মেয়ে, পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর উপযুক্ত বংশধর! আমি সে জন্য তাঁকে খুবই মান্য, শ্রদ্ধা করি।

"একবার তাঁর একজন চাকর আমার সঙ্গে একটু গোলমাল করেছিল। তা নিয়ে ভদ্রলোক একেবারে বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন। তিনি ভদ্রলোক বলেই তো এরকম হয়েছিলেন। নয়ত এ নিয়ে তাঁর বিব্রত হবার কি দরকার ছিল?

"একটা কথা বলি;……'রাণী ভবানীর সম্পত্তির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই। তাঁর কিছুরই সঙ্গে আমি কোনও

রকমে সংসৃষ্ট নই। কিন্তু তবুও তাঁর বংশধর জগদিন্দ্রনাথ যদি একটা বদ্‌মাইস্, যা তা হতেন, আমি মনে বড় কষ্ট পেতাম!"

বিংশ অধ্যায়

দাদা আপনার বদ্‌মেজাজের জন্য সময় সময় অত্যন্ত অনুতাপ করিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিতেন......"আচ্ছা, তোমরা বুঝ্‌তে পার, আগের থেকে আমার মেজাজ্‌টা এখন কিছু ভাল হয়েছে কি না?" আমরা যদি ভালর দিকে মত প্রকাশ করিতাম, তাহলে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে বলিতেন......"তাই বল! তাই বল! এ শুন্‌লে আমার মনটা যে কি খুসি হয়, তার আর কি বলব!'

কোনও দিন কাছারীতে বা অন্য কোনও স্থানে বন্ধু-বান্ধবদিগকে উক্ত প্রশ্ন করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে যদি অনুকূল উত্তর পাইতেন। তবে গৃহে আসিয়াই সর্ব্ব প্রথমে আমাদের নিকট তিনি আনন্দের সহিত সেই কথা প্রকাশ করিতেন।

তিনি বলিতেন......"আমি একটু বদ্‌রাগী তো বটিই। অন্যলোকে যেটা সহ্য করে নেয়, আমি সে যায়গায় বিরক্ত হয়ে দু কথা বলে ফেলি। কিন্তু লোকেরও ব্যবহারের মাত্রা থাকা চাই।

বিংশ অধ্যায়

সমস্ত দিন এই গরমে কাছারীতে চেঁচা-চেঁচি করে, সন্ধ্যায় বাড়ী ফির্‌লাম, অমনি কেউ এসে ধর্‌ল······‘ছেলের কাজের জন্য কাকেও সুপারিশ পত্র দিতে হবে।’ কেউ এসে ধর্‌লেন······‘অমুক কাজে চাঁদা দিতে হবে।’ তখন আমি চটে তাদের ফিরিয়ে দিলেই, অমনি আমায় গালাগালি। যদি তারা একটু দিন-ক্ষণ বুঝে এসে ওসব বলে, তবে দুপক্ষেরই সুবিধা হয়। কিন্তু তা খুব কম লোকই করে।”

“আমি বিরক্ত হয়ে জুনিয়ার উকিলদের বকি বলে তারা আমায় গাল দেয়। কিন্তু তারা নিজের দোষটা দেখে না। মক্কেল তোমায় পয়সা দিয়েছে তার কাজ কর্‌বার জন্য। তুমি ভাল করে ব্রীফ্ পড়্‌বে না, তোমায় মোকর্দ্দমার সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, ভাল জবাব দিতে পার্‌বে না, আর এ সম্বন্ধে কিছু বল্‌লেই তোমরা আমায় গাল্ দিবে? কেউ বা মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে অন্য কিছু না বল্‌তে পেরে, শুধু বলে বসে,...‘আজ্ঞে, কাগজ পড়ে দেখেছি, এর মোকর্দ্দমাটা সত্য।’ যদি এর মোকর্দ্দমাটা সত্য বল্‌লেই জজেরা জিতিয়ে দেয়, তবে বিপক্ষের উকিল জজেদের কাছে তার মক্কেলের মোকর্দ্দমাটা কি মিথ্যে বলবে?

“কখনও এজ্‌লাসে গিয়ে দেখি, জজের কাছে মোকর্দ্দমা উঠেছে—জুনিয়ার নাই। খানিক পরে তিনি পাণ চিবুতে চিবুতে এলেন। এতে আমি বিরক্ত হয়ে তাঁদের বকি; এই আমার দোষ। অপর উকিল হয়ত সে সব সয়ে যায়। পড়াশুনা করে উকিল হয়েছে, কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য-জ্ঞান হয় নাই! অনেকে আবার বলেন······

রাসবিহারী বাবু কেবল আমাদেরই বকেন; কই বড়জুনিয়ারদের বেলায় তো তা হয় না?' কিন্তু ভগবান জানেন, জীবনে আমি ভেতর-বার করে কোনও কাজ করি না। ছোট জুনিয়ার উকিলদেরও যা বলি, ত্রুটী হলে বড় জুনিয়ার উকিলদেরও তাই বলি।

"বসন্ত (শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু) তো আমার খুব বন্ধু ও বড় উকিল। একদিন আমার সে জুনিয়ার ছিল। আসতে একটু দেরী হয়েছিল বলে, আমি তাকে যা তা বলে দিলাম। আমি বসন্তকে বেশ চিনি, সেও আমায় বেশ চেনে। আমি বুঝি, নিশ্চয় বিশেষ কিছু হয়েছে, সেই জন্যই তার আস্‌তে বিলম্ব হচ্ছে। এ সব বেশ বুঝে সুজেও বদ্‌মেজাজের দোষে রাগ সাম্‌লাতে না পেরে তাকে বকে দিলাম।

"কাজ-টাজ্ হয়ে গেলে, বসন্ত যখন আমায় বল্‌লে...... 'ছেলেটার বড্ড অসুখ হয়েছে; ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করব বলে অপেক্ষা কর্‌ছিলাম, তাঁর আস্‌তে বিলম্ব হওয়ায় আমারও আস্‌তে একটু দেরী হ'য়ে গেছে।' আমি কি লজ্জায় তখন পড়্‌লাম। বসন্তের হাত চেপে ধরে বল্‌লাম......'বসন্ত, তোমায় কিছু বল্‌তে হবে না। সব বুঝি; তুমি আমার স্বভাব জান ত? আর কি বলব?' বসন্তকে বকেছিলাম বলে, বসন্ত আমায় গাল দিল কি? সে বিবেচক, নিজের ত্রুটী বুঝেছিল; তাই ছেলের অসুখের কথা শুনিয়ে আমার কাছে সেটা স্বীকার কর্‌তে এল।"

বিংশ অধ্যায়

"বাত হলে আমার কি কষ্ট হয়, তা ত দেখ? সে অবস্থাতেও আমি চেয়ারে করে কাছারী যাই। সে কি নিজের সুখ কর্‌বার জন্য, পয়সা রোজ্‌গার কর্‌বার ইচ্ছায়? আমার যা পয়সা আছে, আমি যদি খুব নবাবী করেও চলি, তাহলেও সে পয়সা ফুরাতে আমার জীবন কেটে যাবে। আমি যে মর্‌তে মর্‌তে এত কষ্ট করেও কাছারী যাই, পয়সার জন্যে, সে কেবল এই ভেবে যে, আমি সেই পয়সা দিয়ে আমার গরীব দেশের যদি একটুও উপকার করে যেতে পারি।

"এ রকম কষ্ট করে কাছারী যাওয়ার জন্যে আমায় দেখে অনেকে হাসে। কত লোকে পরস্পর টেপা-টেপি করে। একদিন স্পষ্ট শুন্‌লাম, আমাকে উদ্দেশ্য করে একজনে অন্যকে বলছে......'লোকে এমনও পয়সা-পিশাচ হয় হে? মর্‌তে মর্‌তেও পয়সার জন্যে কাছারী আসে! লোকের মতি গতিকে ধিক্‌!'

"এইরকম সব শুনে এক একবার আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়েছে। আমি যদি মাগের হাতের খাড়ু গড়িয়ে দেবার জন্যে এরকম করে পয়সা কর্‌তাম, তাহলে আমার মত নীচ লোক পৃথিবীতে যে দুটি নাই, তা নিশ্চয়। কিন্তু আমার এমন করে পয়সা করার উদ্দেশ্য তো তা নয়? আমার নিজের জন্য কি পয়সা খরচ হয়? আমার কোন রকম বাবুগিরি নাই। মক্কেল, ভদ্রলোকরা, আসে বলে,—ঘরে দুচারটা চেয়ার রেখেছি।

"চৌরঙ্গীতে থাকার জন্যে বাড়ীভাড়া কিছু বেশী পড়ে। আমি বুঝি সে পয়সাটায় দেশের কিছু উপকার করতে পারতাম। প্রথম প্লেগের সময় চৌরঙ্গীতে এসে, এখানে থাকা অভ্যাস হয়ে গেল। একটু সুবিধাও আছে দেখ্‌লাম। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে প্রায়ই ঢাক-ঢোল বাজার জন্যে আমি রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না। তাতে বড়ই কষ্ট হতো। এখানে সেটা নাই। তা না হ'লে আমি কখনই বেশী পয়সা বাড়ী ভাড়া দিয়ে চৌরঙ্গীতে এসে থাক্‌তাম না। লোকে হয়ত ভাবে, আমি বড়মানুষী দেখাবার জন্যে চৌরঙ্গীতে এসে আছি।

"কিন্তু বড়মানুষী দেখান যে কেমন তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। এই যে আমার বাড়ীর চারিধারে সাহেবগুলো আছে, তাদের কেউ কেউ আমার কাছে প্রায়ই টাকা ধার চেয়ে পাঠায়। আমি টাকা দিই না বলে তাদের মধ্যে কেউ কোন দিন রেগে আমার ঘরে এসে আমাকে অনায়াসে গুলি করে মার্‌তে পারে। কারণ সে জানে যে, একটা নিগারকে খুন কর্‌লে তার কিছুই হবে না। ট্রেস্‌পাস্‌ করার জন্যে বড়জোর আট দশ টাকা জরিমানা হবে। দাস জীবনের দাম তো এই; তার আবার বড়মানুষী দেখান! 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং' এটা যে সর্ব্বদা মনে গজ্‌ গজ্‌ কর্‌ছে। বাবুয়ানী, বড়মানুষী করবো কোথা থেকে?"

"আমি অনেক সময় ভাবি, আমার অদৃষ্টে হয়ত ভগবান লিখে দিয়েছেন, 'ভালমন্দ যাই করি না, আমাকে লোকের কাছে গাল

খেতেই হবে।' লর্ড মিণ্টোর সময় যখন আমি কাউন্‌সিলের মেম্বার ছিলাম, তখন একবার পুরীতে গিয়ে সেখানের ইমাম্ মঠ্ দেখ্‌তে যাই। সে মঠের অনেক লাখ্ টাকা আয়। মঠের মোহান্ত আমার মক্কেল। তাকে আমার মঠ দেখ্‌তে যাওয়ার কথা আগে থেকে বলা ছিল।

"মঠ্ দেখ্‌তে গেলাম। মোহান্ত আমায় সব জায়গা ঘুরে ফিরে দেখাতে লাগ্‌ল। এক জায়গায় কতকগুলা লোক সাম্‌নে একটা করে পুঁথি খুলে বসে আছে। তাদের দেখিয়ে মোহান্ত বল্‌লে······ 'এঁরা বিদ্যার্থী।' আমি তাঁদের মূর্ত্তি দেখে বুঝলাম্, এদের বাহান্ন পুরুষও বিদ্যার্থী নয়। আমাকে দেখাবার জন্য কতকগুলা লোককে ঐ রকম করে বসিয়ে রেখেছে। তার পর এক দিক দিয়ে ঘুরে মঠ হ'তে বেরিয়ে আস্‌ছি, একটা ভাঙ্গা জানালার ফাঁক্ দিয়ে দেখ্‌তে পেলাম, এক জায়গায় গোটা কতক শাড়ী শুকুচ্ছে। চিরকুমার মোহান্তের মঠে শাড়ী শুকায় কেন?

"যদিও আমি বেশ বুঝেছিলাম কিছুই হবে না, তবুও তখন স্থির করলাম—হিন্দুর দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা বিল কাউন্‌সিলে পাশ করাবার চেষ্টা করব। বিলটা এই যে কোনও লোক ইচ্ছা কর্‌লে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা জজের অনুমতি নিয়ে যে-কোনও মঠের হিসাব-পত্রের খাতা দেখ্‌তে পাবে।

"আমার এই উদ্দেশ্যের কথা এক দিন শিমলায় মিণ্টোকে বললাম। ল-মেম্বারও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উত্তর করলেন, 'এতো খুব ভাল কাজই। কিন্তু এই বিলের কথা একবার হিন্দু সর্ব্ব-

সাধারণকে না জানিয়ে, তাদের মতামত না বুঝে, আমরা কাউন্‌সিল্‌ হ'তে এটা পাশ করতে পারব না।'

"গবর্ণমেণ্টা বিলের কথা সাধারণ্যে—প্রকাশ কর্‌বামাত্র হিন্দু-সমাজের পক্ষ হ'তে অনেকে বিলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে লাগ্‌ল। দুই একটা বাঙ্গালীর পরিচালিত ইংরাজী কাগজে ও কোন কোন বাঙ্গালা কাগজে বিলের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে লেখা লেখি আরম্ভ কর্‌লে। এই সব উল্লেখ করে মিণ্টো আমায় বল্‌লেন··· 'এতে তোমার এ বিল আমরা পাশ করি কি করে ?'

"বিল্‌ তো পাশ্‌ হ'ল না ; লাভের মধ্যে আমি ঘুঁসখোর হ'য়ে গেলাম। শুন্‌লাম, ইমাম্‌ মঠের মোহান্তর, ও আরও অনেক মোহান্তের কাছ হতে বুদ্ধিমান লোকে দেড়লাখ্‌ দুলাখ্‌ টাকা আদায় করে নিয়েছিল। তারা তাঁদের এই বলেছিল যে, রাসবিহারী বাবু বলেছেন,······তাঁকে দুলাখ্‌ টাকা ঘুস্‌ দিলে তিনি এ বিল আর পাশ্‌ করবেন না।

"সেদিন হাইকোর্ট লাইব্রেরীতে কথা উঠ্‌ল—বেশী পয়সা রোজগারের কোন সার্থকতা নাই। এক রকম মোটা-মুটি খাওয়া পরা, আর একটু সুবিধামত বাস কর্‌বার ব্যবস্থা হলেই যথেষ্ট। আমি বল্‌লাম...'তা ঠিক !' তবে গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় যখন গঙ্গার ধারে বেড়াই, তখন ভাবি, এই যে গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগ্‌ছে, আরামে ঘুমাতে ঘুমাতে গাড়ী করে বেড়াচ্ছি, পয়সা না থাক্‌লে এ সুখটা পেতাম না। কিছু বেশী পয়সা থাকায় এই যা একটু সুখ পাচ্ছি।'

বিংশ অধ্যায়

"তখন যোগেশ রায় বল্‌লে, (ও লোক মাঝে মাঝে বেশ এক একটা খাঁটী কথা বলে) 'আপনি যে পয়সা দান করেন, তাতে সুখ পান্‌ না কি ?'

"কথাটা কতকটা ঠিক। কারও একটু অভাব ঘুচুতে পারলে মনে বেশ সুখ হয় বটে ! কিন্তু এই যে আমার কাছে প্রতি দিন ভিক্ষার যত চিঠি আসে, তার সব অভাব ঘুচাতে গেলে, দিন দু তিন হাজার টাকা আয় হওয়া চাই। সে তো আর পারি না ! কাজেই তাদের গাল খেতে হয়। যাদের দেওয়া যায় তারাই ছাড়ে কি ? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত দান আর কে করেছে ? তাঁকেই লোকে গাল্‌ দিতে ছেড়েছিল না কি ?

"একটা গল্প আছে.....বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একজন বলেছিল......'আপনাকে অমুক লোক কেবল গালাগালি দেয় কেন ?' বিদ্যাসাগর মহাশয় তাতে না কি বলেছিলেন...'সে আমায় গাল দেয়, এ আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারি না ; কারণ তার তো আমি কখনও কোন উপকার করি নাই।' এ কথা কতকটা ঠিক।"

"একটা মজার কথা বলি...মানুষের মনের অবস্থা কখন কি হয় বলা যায় না। কাছারি ফেরতের পর কেউ আমাকে ভালমন্দ কিছু বললে, আমি বড় বিরক্ত হই। কিন্তু একবার শরীর ও মন পরিশ্রমে অবশ,—গরমে পাগলের মত হয়েছি, তাতেও একবার একজনের কথায় খুব হেসেছিলাম। এমন ঘটনা আমার জীবনে কখনও হয় নাই।

"একটা মোকর্দ্দমায় যশোর গিয়েছিলাম। জজ্‌টা অতি বোকা। তার সঙ্গে বকতে বকতে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। তার পরে রোদে পুড়্‌তে পুড়্‌তে ছেক্‌ড়াগাড়ীতে টেঁকুতে টেঁকুতে ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমে এসে বস্‌লাম। পাখা পেলাম না, এক গ্লাস জল খেতেও পেলাম না। মাথার ভেতর থেকে যেন আগুন ছিট্‌কে বেরুচ্ছে। এই তো আমার অবস্থা।

"তখন দেখি, ওয়েটিংরুমের দরজায় কতকগুলো লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। তারা না কি আমায় দেখ্‌তে এসেছে। তখন তাদের আর কি করে দরজা থেকে সরে যেতে বলি? চুপ করে বসে আছি। দেখি সেই ভিড়ের মধ্য থেকে একটি বুড়ো লোক আস্তে আস্তে এগিয়ে আমার কাছে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল। তার পর আরম্ভ কর্‌লে······'মহাশয়, ক্ষণজন্মা পুরুষ! শুনি, আপনি দানে দাতাকর্ণ, জ্ঞানে বৃহস্পতি, বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, দানশীলতায় আপনার তুলনা নাই?'

"সে এই রকম যা-তা খানিকক্ষণ বল্‌বার পর, আমি বল্‌লাম 'আপনি ওসব যা শুনেছেন তা ঠিক নয়। একজনের সামান্য কিছু গুণ থাক্‌লে লোকে তাকে অনেক বাড়িয়ে বলে।' তখন সে বল্‌লে···'আজ্ঞে, আর শুনি, আপনি না কি বড় বদরাগী লোক?"

"তখন আমি একটু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লাম···'এই কথাটী যা আপনি শুনেছেন একেবারে ঠিক। এইটাই সত্য কথা।'

বিংশ অধ্যায়

“তখন সে লোকটি কেমন একটু থতমত খেয়ে গেল। তার পরেই আমায় বল্‌লে......‘তবে যে আপনি হাস্‌ছেন?’

“আমি বল্‌লাম···‘একটু হাসলেমই বা?’ বুড়ো বল্‌লে······ ‘তা কি হয় মহাশয়, বদ্‌রাগী লোক কি কখনও হাসে?’ তখন আর আমার হাসি রাখবার যায়গা নাই। কিন্তু অমনি বুড়ো কি জানি কেন মুখটি একটু চুণপারা করে আস্তে আস্তে আমার সাম্‌নে থেকে চলে গেল।”

দাদা যখন কাছারি বন্ধ হলে বাহিরে কোথাও বেড়াইতে যাইতেন, তখন সেখানকার লোক তাঁহাকে বলিতেন.....‘এখানে আপনাকে দেখ্‌লে আর কল্‌কাতার রাসবিহারী ঘোষ বলে মনে হয় না।’ তিনি তাঁদের বুঝাইয়া বলিতেন······‘দেখুন, আমার এখানে কাজকর্ম্ম নাই, সেই জন্যেই আপনাদের সঙ্গে হেসে, গল্প করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কল্‌কাতায় আমার দিনের বেলায় ভাত খাবার সময় থাকে না। সেথায় আমি যদি দুমিনিট করেও ফি লোকের সঙ্গে কথা কই, তাহলে সমস্ত দিনে আমার দু ঘণ্টারও উপর সময় যায়। এতে আমার কাজের কত ক্ষতি হয়!

“তাই অনেক সময় ইচ্ছা করেই আমি সেখানে লোকের সঙ্গে ভাল করে কথা কই না; এই ভেবে যে, এরকম কর্‌লে লোক আর আমার কাছে আস্‌বে না। মক্কেল আমায় পয়সা দিয়েছে, তার ভাল করে কাজ করাটাই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আমি যদি লোকের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়িত করে সময় কাটাই,

তাহলে তাদের কাজে ফাঁকি দিতে হয়। দেখুন, ঠিক রীতিমত কর্ত্তব্য বুঝে চল্‌তে গেলে সময়ে সময়ে অনেকের কাছে ছোট লোক হতে হয়। আমিও তাই অনেকের কাছে সেই রকম হয়েছি। তা এখন কি কর্‌ছি? তাতে আমি দুঃখিত নই।"

একবিংশ অধ্যায়

দাদার পাঠে অনুরাগের কথা কি বলিব। শুনিলে যেন গল্প বলিয়াই মনে হয়। যখন তিনি বাতে আক্রান্ত হইতেন, তখন সদ্য বলি দেওয়া ছাগলের ন্যায় বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেন। তাঁহার সে সময়ের যন্ত্রণা ও কাতরোক্তি দেখিয়া সকলের চোখে জল বাহির হইয়া পড়িত। কোন কোনও রাত্রিতে যখন যন্ত্রণা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিত, তিনি তখন কতকগুলি বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। সে সময় তাঁহাকে আর কোনও রকম কাতরতা প্রকাশ করিতে দেখা যাইত না।

এ বিষয় তাঁহার নিকট উল্লেখ করিলে তিনি বলিতেন...... 'আমি বই পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, তাতে আমার মন এত বসে যায় যে, অন্যদিকে সে সময় আর কোনও জ্ঞান থাকে না। আমার বাতের এত যন্ত্রণা, আমি দিনরাত অনবরত বই পড়ে সব ভুলে থাক্‌তে পারি। কিন্তু তা করি না। মনে

ভয় হয়, 'একেই চোখ খারাপ, তাতে বাতের সময় এরকম করে পড়ে চোখের আবার কিছু দোষ হয়ে কি কাণা হয়ে যাব ?'

আলমারী হইতে বই বাহির করিয়া দিবার জন্যে তাঁহার পুস্তকালয়ে দুজন লোক নিযুক্ত ছিল। একবার তাঁহার জনৈক প্রবাসী বন্ধু, কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়া কয়েক দিবস ছিলেন। তিনি প্রতি দিন বিস্ময়ের সহিত দেখিতেন, 'দুজন লোক ক্রমাগত দাদাকে লাইব্রেরী হইতে বই যোগাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে।'

এক দিন তিনি এ বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক দাদাকে বলেন...'আচ্ছা, ওরা তো তোমাকে না হয় সকাল হতে রাত্রি পর্য্যন্ত বই ব'য়ে দিল ; কিন্তু তুমি এ সব পড়ে আয়ত্ত কর কি করে, বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না ?'

উত্তরে দাদা বলিলেন......"ও কিছু নয়। আমি ছেলে বেলায় ভাবতাম, 'ধোপারা এত লোকের কাপড় নিয়ে এসে ঘাটে সব এক সঙ্গে কেচে আবার যার যা কাপড় সবাইকে ঠিক্ ঠিক্ ফিরিয়ে দেয় কি করে ?" ইহাতে তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন...'তুমি বেশ দৃষ্টান্তটা দিয়ে তো বুঝিয়ে দিলে ?'

একবার এটর্ণি বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, দুইজন উকিল, ও দাদা একত্র মিলিত হইয়া একটা মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ করিতেছিলেন। আইন দেখিবার প্রয়োজন কালে, পুস্তকের

একবিংশ অধ্যায়

আবশ্যকীয় স্থান বাহির করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে, দাদা তাহাতে অধীর হইয়া, ব্যস্ততার সহিত পুস্তকের সেই স্থানের পত্র সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিলেন। বারকয়েক এইরূপ করার পর দাদাকে সম্বোধন করিয়া ভূপেন্দ্রবাবু বলিলেন..."আপনার এমন Wonderful memory ও intelligenceটা কেবল ট্যাকশালের কাজ করেই গেল ?'

তাহাতে দাদা বলিলেন..."আমার ইচ্ছা ছিল যে, ডাক্তারী শিখবো। ছেলে বেলা থেকে আমার মনে হতো,'বৎসরে এ দেশে কত লোক সাপের কামড়ে মরে, আমি ডাক্তারী পড়ে সাপের বিষের একটা ঔষধ বের করবো। সে জন্যে কলেজে পড়বার সময় সহপাঠীদের দু'একজন যখন মেডিক্যাল্ কলেজে পড়তে গেল, আমারও সেখানে পড়তে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। বাবা তাতে অমত করলেন বলে, আর যাওয়া হ'ল না। নয়তো আমার ধ্রুব বিশ্বাস—আমি সাপের বিষের ঔষধ বের করতাম। তা না হয়ে উকিল হ'য়ে, হরের ধন শ্যামা পাবে, না শ্যামের ধন হরে পাবে, এই করে কেবল মাথা ঘামিয়ে মলাম্।"

"আমাদের দেশে এত লোক ডাক্তার হচ্ছে, কিন্তু কেউ কি এ বিষয়টার জন্যে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌লে না ? যদি এ দেশের মত ইয়োরোপে সহস্র সহস্র লোক প্রতি বৎসর সাপের কামড়ে মরতো, তাহলে নিশ্চয় সে দেশের লোক সাপের বিষের ঔষধ বের করে দিত।"

দাদা বলিতেন..."মাথায় টিকি রেখে সকাল-সন্ধ্যায় জপ আহ্নিক আর হবিষ্য করলেই যে হিন্দু, আর আমি একটা মুরগী খেলাম বলেই যে অহিন্দু, তা আমি কখনো স্বীকার করবো না! পশ্চিমা হিন্দুদের তো মাছ পাঁটা খেলে জাত যায়! বাঙ্গালী বামুন পণ্ডিতরাও তা খায়। আবার কাশ্মীরি পণ্ডিতরা তো মুরগী খায়। একটা সামান্য কিছু খাওয়া-খায়েই নিয়ে, 'ও হিন্দু, কি অহিন্দু?' এ বিচার করা ঠিক্ নয়।"

"যারা টিকি রেখে, জপতপ করে, হবিষ্যি খেয়ে, হিন্দুয়ানা ফলায়, আর এ দিকে দেবোত্তর সম্পত্তি লুটবো, বিধবা ভাদর বউকে বাড়ী হতে তাড়াব, নাবালক ভাইপোদের পৃথক করে ফাঁকি দেবো, তার ভাবনায় ঘুম নাই; তারা হবে নাকি হিন্দু? আমি হিন্দুর বৃথা কুসংস্কারগুলা মানি না। তা ছাড়া সব হিন্দুয়ানী পূর্ণমাত্রায় মেনে চলি।

"তবে হিন্দুয়ানীর একটা যা বড় নিষেধ, বড় পাপ বলে,—'মদ্ খাওয়া' সেটা আমি করি। এর জন্য আমার মনঃকষ্টের শেষ নাই। কি পাপে আমার এ মতি হয়েছিল! আমার জীবনের একমাত্র অনুতাপ করতে হলো, কেবল এই কু-অভ্যাসের জন্য! আমি ইংরেজ বা সেকালের বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার হলে, কোনও কথাই ছিল না! কিন্তু আমি হিন্দু থেকে হিন্দু সমাজের যেটা নিষিদ্ধ, পাপ, সেটা করি বলেই আমার এতে এত অনুতাপ হয়। আর এর জন্য যে, হিন্দুরা আমায় নিন্দা করে, ঠিক্ই ক'রে।"

একবিংশ অধ্যায়

"কু অভ্যাস এমনি জিনিস, যার জন্য প্রাণে বেদনা পাই, অথচ সেটা ছাড়্‌তে পারি না! সিলোনে একটা বুদ্ধ মঠে গিয়ে আমি বৌদ্ধ হ'তে চেয়েছিলাম। মঠের পুরোহিতরা আমাকে তাদের কতকগুলি সর্ত্ত পালন করতে প্রতিজ্ঞা করিয়ে, বৌদ্ধ পোষাক পরিয়ে দিতে রাজি হয়েছিল। সে সব সর্ত্তের মধ্যে একটা সর্ত্ত ছিল, 'মদ্ খেতে পাবে না।' আমি সকল সর্ত্তই পালন করতে রাজি হয়েছিলাম, কিন্তু এই 'মদ খাওয়া' *কু-অভ্যাস ছাড়তে পারবো কিনা ভেবে, বৌদ্ধ হ'তে* পারলাম না।"

"বি-এ পরীক্ষার সময় আমার জ্বর হয়ে খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়ি। বল পাবার জন্য, ডাক্তার ব্রাণ্ডি খেতে দিত। সেই হতে আমার এই কু-অভ্যাস হয়।

লোককে ডাক্তারী ঔষধ খেতে দিতে তাই আমি এত নারাজ। সেই জন্যই এলোপ্যাথিক্ ঔষধের উপর আমি এত চটা।"

"তোমার একবার ছেলেবেলায় খুব অসুখ করেছিল। গঙ্গাপ্রসাদ বাবু তোমায় দেখেছিলেন। এক দিন তোমার ধাত ছেড়ে যাচ্ছিল, গঙ্গাপ্রসাদ বাবু আমায় বল্‌লেন...'এখন একটু ব্রাণ্ডি দেওয়া ছাড়া আর আমাদের কোনও ঔষধ নাই।' আমি তখনও তোমাকে ব্রাণ্ডী দিতে, তাকে বারণ করেছিলাম। পরে শুনেছিলাম, 'আমার কথা না শুনে তিনি লুকিয়ে তোমায় ব্রাণ্ডী দিয়েছিলেন।"

ইংরাজ-জাতি সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"আমরা মুখে

ইংরাজদের যতই গালা-গালি করি না কেন, ও জাতের যা' গুণ আছে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতের মধ্যে তা দুর্লভ। তবে হাঁ, ওদের জাতে যেমন ছোট লোকের (গরীব বল্‌ছি না, এ কথাটা আমরা প্রায় গরীবদের প্রতি ব্যবহার করি; Base, mean বল্‌ছি) অভাব নাই, আমাদের দেশে সে রকম লোক জন্মায়ই না। কিন্তু ওদের মধ্যে বড় লোক, (বড় লোক,—পয়সাওয়ালা বল্‌ছি না; আমরা সচরাচর এ কথাটাও বড় ভুল ব্যবহার করি, বড় লোক,—Great man বল্‌ছি) দেবাত্মার মত লোক যেমন আছে, আমাদের মধ্যে তেমন কই?

"দৃষ্টান্ত দেখ, ফাদার ডেমেন্, (Father Damien) কুঠে হ'য়ে মরবো জেনে-শুনেও কুঠের সেবা করে, নিজে কুঠে হয়ে মর্‌লেন। এ রকম ওঁদের জাতে আরও আছেন। আমাদের মধ্যে ওরকম একটাও মিলে? ও দেশের লোক আমাদের দেশে এসে কুঠেদের আশ্রম করে দিচ্ছে, তাদের সেবা কর্‌ছে। আমাদের দেশের লোক ও রকম কয়টা করে?

"এক কথা আছে,—'আমরা গরীব, অত পয়সা নাই।' কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা থাক্‌লে পয়সার তেমন অভাব হয় না। দেশের লোক এয়ারকি দিয়ে, বাবুয়ানী করে, বৃথা কত পয়সা উড়ায়? অতগুলা থিয়েটার চল্‌ছে কাদের পয়সায়? আর একটা কুষ্ঠাশ্র[illegible] করতে হলেই দেশের লোক গরীব হয়।

"যে জাতের যত গুণ, সে জাতের তত উন্নতি। শুধু গায়ের

ফাদার ডেমেন পৃষ্ঠা—১৭২

একবিংশ অধ্যায়

জোরে ইংরেজ আজ প্রায় পৃথিবী জুড়ে বসেছে, একথা কোনও বিবেচক লোকই বলবে না। দাসত্ব প্রথা তুলতে ইংরাজ জাত কত রক্ত, কত অর্থ ব্যয় কর্‌লে। আমরা হলে হেসে বিজ্ঞের মত বলে বস্‌তাম, 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার দরকার কি?'

"ইংরাজদের গালাগালি দেবার সময় বলি যে, 'আমরা নিজেরাই আমাদের আপন দেশ, ইংরেজদের জিতিয়ে দিয়েছি।' কথাটা বড় মিথ্যা নয়। কিন্তু এ কাজ আমরা কেন করেছিলাম, বা এখনও কেন ক'রছি? ইংরাজরা তো জোর করে এ কাজ করতে আমাদের বাধ্য করে নাই, বা করে না! নিশ্চয় তাদের এমন কিছু মহৎ গুণ আছে, যাতে আমরা আকৃষ্ট হ'য়ে, ধন-প্রাণ দিয়ে তাদের জন্যে এ কাজ করে আস্‌ছি।"

"বার্ক, মেকলের মত মহানুভব, উদার-প্রাণ লোকের তুলনা কোথায় পাব? মেকলে আমাদের খুবই গালা-গালি দিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি আমাদের যে উপকার ক'রেছেন, তার তুলনায় সে গালা-গালি কিছুই নয়। মেকলে আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করবার জন্য স্বজাতির নিকট ওজস্বিনী বক্তৃতায় যে বার্ত্তা প্রচার করেছেন, সে কেবল একমাত্র ইংরাজ জাতিরই পক্ষে সম্ভব।

"মেকলে যদি এ দেশে ইংরাজি শিক্ষার জন্য সেরূপ প্রাণপণে না যুঝতেন, তবে জগতে আমাদের দশা আজ কি হতো, সে কথা

ভাবলেও প্রাণে আতঙ্ক হয়। ভগবানের যদি এই বিধানই হয় যে, ভারতবর্ষকে একটা নির্দ্দিষ্ট কালাবধি বিজাতীয় অধীনতা স্বীকার ক'রতেই হবে। তাহলে ভারতবর্ষ যে ইংরাজের অধীন হয়েছে, এটা তার সৌভাগ্য বলেই আমার মনে হয়!"

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কখনও কখনও সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ দাদা কোচে চুপ করিয়া শুইয়া কেবল তামাক টানিতেন এক দিন আমাদের বলিলেন, "আমি যখন এমন ভাবে তামাক টানি, তোমরা তা দেখে কি মনে কর ? আমি চুপ করে শুয়ে শুয়ে কেবল তামাক টান্‌ছি ?…তা নয় ! তখনও আমি নানা কথা ভাবি। আইন্, মোকর্দ্দমার বিষয় নয় ! ভাবি,…'কালিদাস উজ্জয়িনীতে নিজের সামান্য ঘরের দাওয়াটীতে বসে, গুটি কতক শ্লোক লিখে হয়ত রাজার কাছে নিয়ে যেতো। রাজা তা শুনে যদি একটু আহ্লাদ জানাত, তাহলে বামুন একেবারে আপ্যায়িত হয়ে যেতো। তার উপর কিছু বক্‌সিস্ পেলে ত আর কথাই নাই !'

"কালিদাসের নামে যে গল্প আছে…কালিদাসকে মূর্খ দেখে তাঁর স্ত্রী বাড়া হতে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ; পরে সরস্বতীর বরে তিনি পণ্ডিত হলে, স্ত্রী তাঁকে এনে আবার আদর যত্ন কর্‌তে লাগল। আমি ভাবি এ গল্পের মধ্যে কিছু সত্য থাকৃতে পারে।

"হয় তো তাঁর স্ত্রীটা মুখরা ও রুক্ষস্বভাবা ছিল। কালিদাস প্রথম প্রথম তেমন পয়সা কড়ি রোজগার করতে পারতেন না, সংসারে খুবই অভাব ছিল—সে জন্য একদিন স্ত্রীটা হয় তো কালিদাসের সঙ্গে খুব ঝগড়া করে তাঁকে বাড়ী হতে চলে যেতে বলে। সেই দুঃখে কালিদাস দেশত্যাগী হয়ে কিছু কাল এদেশে

ওদেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। হয়ত আমাদের বাঙ্গালা দেশেও এসেছিলেন; কারণ তাঁর বইয়ে আমাদের দেশের অনেক বিষয় লেখা আছে। আর যে সব দেশে গিছলেন, সে সব দেশের রাজাদের সভায় কবিতা শুনিয়ে হয়ত অনেক টাকাও করেছিলেন।

"শেষে তিনি সেই সব টাকাকড়ি নিয়ে ঘরে ফিরে গেলে, স্ত্রী তাঁকে খুবই আদর যত্ন করে নিয়েছিলেন। তার পর শকুন্তলা, রঘুবংশ, এই সব বই লেখাতে লোকে বল্‌লো···'কালিদাস তপস্যা করে সরস্বতীর বর পেয়ে বাড়ী ফিরে এল।'

"বিদেশে থাক্‌বার সময় স্ত্রীর বিচ্ছেদে কালিদাসের যা সব মনে হতো, সেই গুলিই যক্ষের মুখ দিয়ে বলিয়ে হয় ত মেঘদূত লিখেছিলেন। কালিদাস ঘরের দাওয়ায় বসে, ভূর্জ্জপত্রে কিম্বা তোলট্‌ কাগজে যখন শ্লোকগুলি লিখতেন, তখন তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও মনে ভাবেন নাই যে, তাঁর সেই শ্লোকগুলি এক দিন পৃথিবী শুদ্ধ লোক পড়ে' তাঁকে ধন্য ধন্য করবে।"

"তোমাদের কাছে কতবার আক্ষেপ করেছি, 'আমাদের দেশের এমন সংস্কৃত ভাষাটা আমি ভাল করে শিখ্‌লাম না।' তাই ভাবি···'যদি আমি সংস্কৃত ভাষাটা ভাল করে শিখ্‌তাম, তাহলে গীতার শ্লোক-গুলা নিয়ে বেশ তর্ক করে একটা ভাল বই লিখ্‌তে পারতাম।'

"শ্রীকৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় অর্জ্জুনকে শ্লোক করে ও সব কথা বলেছেন যে, তা কিছু ঠিক নয়। তবে কৃষ্ণই হউক, বা অন্য যে কেউই হউক, ধীরে সুস্থে, বেশ ভেবে চিন্তেই গীতা লিখেছেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সে লোকের কি অগাধ পাণ্ডিত্য। মানুষকে কোন একটা বিষয় নানা রকমে বুঝাবার তাঁর কি অসাধারণ শক্তি। তিনি যদি এখন কল্‌কাতা হাইকোর্টে এসে ওকালতি করতেন, তবে উড্‌রফ্‌ই বল, আর রাসবিহারী ঘোষই বল, সেই যে একটা কথা আছে 'কল্কে পেতে হবে না,' তাহলে আমাদের দশা তাই হতো। কাকেও আর কল্কে পেতে হতো না!

"কখনও ভাবি, 'যাঁরা পরকালে খুব বিশ্বাস করেন, তাঁরা একরকম বেশ সুখী লোক।' পনর আনা লোকই তো আশা নিয়ে জীবন কাটায়। পৃথিবীতে একে একে যখন তাদের সব আশাই ফুরিয়ে যায়, তখন তারা পরকালের আশায় থাকে। কারও স্ত্রী, ছেলে, মা, ভাই মর্‌লে, তারা পরকালে আবার তাদের মিলনের আশায় প্রাণে যে শান্তিটা পায়, সেটা মানুষের পক্ষে কম লাভ নয়! কিন্তু যাদের পরকালে বিশ্বাস নাই, তারা নিশ্চয় ওদের চেয়ে প্রাণে বেশী কষ্ট পায়।

"আমি কিন্তু আর পরকাল-টরকাল চাই না। 'একবারে সেই বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ!...সেই নির্ব্বাণই কায়মনে প্রার্থনা করি!' কিন্তু আমি এইখানে একটা কথা বলি। সামান্য একটা আইনের বিষয় আমি যা বল্‌বো, সেটা যেমন তোমরা মেনে নিবে, আমার এ কথাটাও সেই রকম মেনে নিও।

"আমি বাড়্‌তি বা মিছে কথা কখনও বলি না। আমি জীবনে দু-একটা এমন প্রমাণ পেয়েছি, যাতে বেশ বুঝেছি, 'মানুষ মরলেই যে তার সব ফুরাল, তা নয়!' অবশ্য এ কথা প্রায় সকলেই বলে।

আমি নিজে এর বেশ প্রমাণ পেয়েছি, কিন্তু সেটা কি রকম করে যে, কি হলো ; পরেই বা সেটা কি হতে পারে, তার কিছুই আমি এ পর্য্যন্ত ভেবে ঠিক করতে পারি নাই।

"কখনও ভাবি···মানুষ যে রকম যোগের দ্বারা মাটি চাপা থেকেও অনেক কাল বেঁচে থাকতে পারে, সেই রকম যদি যোগ শিখ্‌তে পারি, তাহলে এখন মাটি চাপা থেকে দু-তিনশো বছর পরে একবার উঠে দেখি, 'দেশের দশা কি হলো! ইংরেজ দেশ ছাড়্‌ল কি না? তাদেরই বা কি হলো, কোথায় বা গেল তারা?"

"আবার ভাবি, যদি একটা কোনও গ্রহের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীটার ধাক্কা লেগে একেবারে চুরমার হয়ে যায় ; তাহলেও একেবারেই নিশ্চিন্ত! আর দেশের কথা ভেবে ভেবে মরতে হয় না। আমরাই তাহলে শেষটায় জিতে যাই। যাদের কষ্টের জীবন তাদের আর মরলে দুঃখ কি? পৃথিবীতে যাঁরা স্ফূর্ত্তি করে' বুক ফুলিয়ে, লাথি মেরে নিগার খুন করে বেরাচ্ছেন, তাঁদেরই ধড়ফড়ানি 'হা হতাশ' পড়ে যায়!"

—

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দাদা দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও বারই তাঁহার দাম্পত্য জীবন সুখের হয় নাই। প্রথমা পত্নী শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দাসী, গুণবতী ও অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন। সুললিত কবিতা রচনায় তিনি আনন্দ উপভোগ করিতেন। বিবাহের পর কয়েক বৎসর মাত্র জীবিতা থাকিয়া এক দিন দাদার একটা অতি তুচ্ছ কথায় তিনি অভিমানে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইহাতে দাদা হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইয়াছিলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর কাছারির ছুটিতে যখন তিনি তোড়কণায় যাইতেন, প্রথম কয়েক মাস সায়াহ্নে সকলের অজ্ঞাতসারে শ্মশানে গিয়া পত্নীর চিতাভস্মের উপর পড়িয়া ক্রন্দন করিতেন। বাবার অনুরোধে দাদা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, কিন্তু এ বিবাহে তাঁহার আদবেই ইচ্ছা ছিল না।

প্রথমা পত্নীর বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন··· "স্ত্রী, স্বামীর কত তিরস্কার ভৎ‍ঁসনা হাসিমুখে সহ্য করে। আমি এক রকম পরিহাসচ্ছলেই তাকে বলেছিলাম, ছেলে পাবার আশাতেই পুরুষ মানুষ বিয়ে করে। নয়তো কে আবার একটা মেয়ে মানুষের ভার আজীবন ঘাড়ে নেয়?' আমার এই সামান্য কথাটুকু স্ত্রীর সহ্য হলো না! গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌লো!"

"যাহা হউক, ভগবান আমার অদৃষ্টে যা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন,...ভালই! আমি ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীর হাঙ্গামা হয়তো পোয়াতে পারতাম না। আমি বই পড়ে যে সুখ পাই তার তুলনা নাই। এ সুখ তাহলে আমি পেতাম না। বই পড়ে আমি ভুলতে পারি না, এমন শোক, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা পৃথিবীতে কিছুই নাই! তবে ছোট ছোট ছেলের সঙ্গে খানিকটা করে কথা কইতে বড় ভালবাসি।"

দাদা আত্মীয়, স্বজন ও ভৃত্যদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তাহাদের সকল রকম অভাব মোচনে কখন বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। ভৃত্যদের প্রায়ই তিনি বলিতেন—"তোদের বাবা, মা তোদের যে কত যত্ন করে তা জানি না; কিন্তু তাদের চেয়ে আমি তোদের কম যত্ন করি না। এ আমার বিশ্বাস।"

যদি কখনও ভৃত্যদের কাহারও কোনও দোষের জন্য গুরুতর তিরস্কার করিয়া ফেলিতেন, তবে কিছুক্ষণ পরে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া আপনার ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক বলিতেন···'তোরা তো জানিসই—আমি একটু বদরাগী। তাতে সময়ে সময়ে যদিই তোদের একটু বেশী বকে ফেলি, সে সব কিছুই নয় ভেবে নিয়ে মনে একটু দুঃখ করিস না।'

হায় দাদা! আপনি নানা দেবদুর্ল্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন। ভগবান আপনাকে কেবল অতুল প্রতিভা দিয়া এ জগতে পাঠান নাই। তৎসঙ্গে পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য, শিশুসুলভ সরলতা ও কোমলতা, জননীর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ও দিয়াছিলেন!

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কিন্তু হায়, আপনার নিতান্ত অন্তরঙ্গ, নিজজন ভিন্ন কে আর তাহা অনুভব করিতে পারিল? যে হেতু লোক দেখান কর্ম্ম যে আপনার সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল।

যেকালে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, সে সময় তোড়্‌কণায় একটি স্ত্রীলোক সতী হইয়াছিলেন। যে স্থলে এই সতীদাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়, সে স্থানকে লোকে সতীর ডাঙ্গা বলিত। দাদা তথায় একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে প্রতি সন্ধ্যায় আলো দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন……'যেন গ্রামের কোনও স্ত্রীলোক সন্ধ্যার সময় সেই প্রদীপটী জ্বালিয়া দিয়া আসে।'

কিছু দিন তাঁহার এই আদেশ পালন করা হইয়াছিল। পরে আর কোনও স্ত্রীলোক সন্ধ্যার সময় সেই প্রদীপটা জ্বালিয়া দিতে না যাওয়ায় তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন……'আর কি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সে মতি-গতি আছে?' জোর করে এ কাজ কি আর কাকেও বাধ্য কর্‌তে ইচ্ছা হয়? যদিও সতীদাহ-প্রথা ভাল ছিল না, কিন্তু যাঁহারা স্বেচ্ছায় সতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যেন জগতে ভক্তি সহকারে চিরদিন বিঘোষিত হয়।'

দাদা বলিতেন……"পৃথিবীতে তিনটা জিনিস আমি বড় ভালবাসি। সর্ব্বপ্রথম বই, তারপর ফুল ও কুকুর।" তাঁহার কুকুরের প্রতি ভালবাসার কথা কি বলিব! কাছারী হইতে আসিলে তাঁহাকে যে বৈকালিক আহার দেওয়া হইত, উহার সহিত কুকুরের জন্যও কিছু বিসকুট বা মিষ্ট দ্রব্য দিবার ব্যবস্থা ছিল।

তিনি নিজে আহার করিতে করিতে পার্শ্বে উপবিষ্ট কুকুরগুলিকেও সেই সব দ্রব্য খাইতে দিতেন।

তিনি বাহির হইতে গৃহে ফিরিলে, অমনি কুকুরগুলি গিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক লেজ নড়িয়া তাঁহার চারিধারে যখন ছুটা-ছুটি করিত, লাফাইয়া তাঁহার গায়ে উঠিতে যাইত, তখন তিনি বলিতেন —"দেখ, দেখ, এদের কি আহ্লাদ? যাদের ছেলেপিলে নাই, তারা কুকুর পুষুক। সমান সুখ পাবে। বরং কুকুর চিরদিন এমনি ভাবেই প্রভুকে ভালবাসে। আজকাল ছেলে ষোল পেরুলেই বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্তে চায় না। এই দুঃখেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত লোকও বলতেন……'মহাপাপ করলে তবে ছেলের বাপ হয়।"

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ইংরাজি ১৯১৭ সালে দাদার হাইকোর্টে সুখ্যাতির সহিত পঞ্চাশ বৎসর ওকালতি করা পূর্ণ হইলে, হাইকোর্টের উকীল-সমিতি তাঁহার রৌপ্য-জুবিলি উৎসব সম্পন্ন করেন। সেই উপলক্ষে গুরুদাস বাবু দাদাকে বলিয়াছিলেন......'আপনার রৌপ্য-জুবিলি তো দেখলাম। আপনি তো টিক্‌বেনই। আমিও এ জীর্ণ হাড় কয়খানাকে আরও কয়টা বছর খাড়া করে রেখে, আপনার স্বর্ণ-জুবিলিটাও দেখে যাবার খুবই আশা করি।'

কিন্তু হায়! নিয়তি তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইতে দিলেন না। ইহার পর দুই বৎসর গত না হইতে হইতেই গুরুদাস বাবু স্বর্গলাভ করিলেন। গুরুদাস বাবুর মৃত্যুতে দাদা অত্যন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন......'ঠিক্ গুরুদাস বাবুর মত লোক আর একটি বাঙ্গালায় কবে হবে?' যেমন উচ্চ-শিক্ষিত, তেমনিই বিনয়ী, সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমি তো এতকাল ধরে প্রতি দিনই ওঁর সঙ্গে মেলা-মেশি করে আস্‌ছি, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও আমাদের দুজনের মধ্যে কখনও মন কষা-কষি হয় নাই।'

অধিক বোকামি করিবার জন্য হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিস্ হইতে কোন জজ্‌কেই তিনি বকিয়া দিতে রেহাই করেন নাই। কিন্তু গুরুদাস বাবুর সহিত তাঁহার কখনও সেরূপ ঘটে নাই।

ক্যানিংহামের স্থানে গুরুদাস বাবু কিম্বা তিনি এই দুজনের

মধ্যে একজনের যখন জজ হইবার কথা উঠে, তখন হাইকোর্টের জনৈক লোক তাঁহার নামে জজ্‌দের নিকট নানা রকম কুৎসা রটনা করিয়া বলে……'রাসবিহারী যে রকম বদ্‌রাগী, ও জজ্‌ হলে অন্যান্য জজ্‌দের সঙ্গে তাঁর সর্ব্বদা ঝগড়া হবে। ও রেগে বই ছুড়ে উকীলদের মারবে।' এই রকম সব……।

জজ্‌ নরিশ্‌ দাদাকে সে সব কথা বলে। গুরুদা[illegible]বুও সে সকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন……'আমিই জজ্‌ হই বা আপ্‌নিই জজ্‌ হন্‌, এ নিয়ে ও-লোকটার এমন নীচতা করা কেন? আমি জজ্‌ হলে, আমার লাভ এইটুকু যে, মায়ের মনে নিশ্চয় একটু সুখ হবে। কিন্তু আপনি জজ্‌ না হলে আপনার কি ক্ষতি হবে সে ভাবে? পয়সা…? সে যা হবে, সে তো ভগবানই জানেন! আর যদি জজীয়তির সম্মানটা আপনার হ'লো না ভাবে, তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, নিশ্চয় করে বলে দিচ্ছি যে, [illegible]পনার প্রতিভা এক দিন জজীয়তির সম্মানকে ম্লান করে দিবে!"

ইহার কয়েক বৎসর পর ল্যান্‌স্‌ডাউনের সময় যখন [illegible]নি কাউন্‌সিলের মেম্বার ছিলেন, সেই সময় একবার ল্যান্‌স্‌ডাউন [illegible] শিমলা হইতে কল্‌কাতায় আসেন, তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্যে হাইকে[illegible] জজেরা ও অন্যান্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, এবং লাট-সভার স[illegible]রা হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে থ[illegible]লই ল্যান্‌স্‌ডাউন্‌ গাড়ী হইতে নামিয়াই দাদার হস্ত ধারণপূর্ব্বক একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া একটা বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পর নিজের গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া যান।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গুরুদাস বাবু তখন দাদার নিকটে গিয়া বলিলেন......'জজ্‌দের মানটা যে কত তার পরিচয় তো আজ পেলেন? আপনি জজ্ না হওয়ায় তখন বোধ হয় মনে কিছু কষ্ট পেয়েছিলেন? কিন্তু যে আপনার কুৎসা রটনা করে আপনার জজ্ হওয়ায় বাধা দিয়েছিল, সে আপনার কি মঙ্গলই করেছিল! আমি ক্ষীণ-জীবী বামুনের ছেলে, এক এক সময় ঘেনোর-ঘেনোর বৃথা সওয়াল জবাব শুনে মাথা বিগ্‌ড়ে যায়। আপনি হ'লে এ কথনই সহ্য করতে পার্‌তেন না। জজীয়তিতে ইস্তপা দিয়ে ফেল্‌তেন।'

তার পর যখন একে একে কয়েকজন বাঙ্গালী হাইকোর্টের জজ্ হইলেন, তখন কোর্টের লাইব্রেরীতে এক দিবস কয়েকজন উকীল দাদাকে বলেন......'আপনি তো নিজের সব লোককটীকেই জজ্ করে দিলেন; কৃতান্তই (শ্রীযুক্ত কৃতান্তকুমার বসু) আর বাকী থাকে কেন?' তাহাতে বসন্তবাবু বলেন......'কৃতান্ত চারটা জজ্‌কে মাইনা দিয়ে রাখ্‌তে পারে। তা না হ'লে, সেও হতো বই কি!'

এই সব কথা তুলিয়া গুরুদাস বাবু এক দিবস দাদাকে পরিহাস করিয়া বলেন......'কলিতে বামুন কেবল ভিখারীর জাত্ হয়েছে। এখন আর তাদের কথা তো কেউ মানেন না। কিন্তু এ বামুন এক দিন যা 'ভবিষ্যৎ' বলেছিল, তা ফল্‌লো কি না?'

দাদার ওকালতী সম্বন্ধে একটা কথা বলি। মাত্র আট নয় দিনের ব্যবধানে এক জজেরই কাছে ঠিক্ এক রকমেরই দুটা মোকর্দ্দমায় পরস্পরের বিভিন্ন দিক সওয়াল জবাব করিয়া তিনি

হুটা মোকর্দ্দমাই জিতিয়াছেন ; এই লইয়া গুরুদাস বাবু দাদাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন……'আপনি জজ্‌দের নিয়ে যা কাণ্ড করছেন, এখন পেন্‌সন্‌টা নিয়ে মানে মানে যেতে পারলে বাঁচি !'

একবার গুরুদাস বাবুর এজ্‌লাসেই, এক দিনেই, পর পর ঠিক এক রকমের তুইটা মোকর্দ্দমা উঠিয়াছিল। তিনি প্রথমটার সওয়াল্ জবাব করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন, তখন গুরুদাস বাবু দাদাকে বলেন……'দ্বিতীয়টাও সওয়াল্ জবাব করুন না ? কোর্ট শুন্‌তে বড় ইচ্ছা করে।' তাহাতে দাদা তাঁহাকে একটু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন……'উপরি উপরি আর তা হয় না ! যদি একদিন কি তুদিন পরেও হতো, তা হলেও আমি কোর্টের ইচ্ছা পূর্ণ করে তাঁকে সুখী ক'রতে পারতাম।'

দাদা বলিতেন যে, গুরুদাস বাবুর মিষ্টি বিদ্রূপ করিবারও বেশ ক্ষমতা ছিল। তিনি সুরসিকও ছিলেন। সময়ে সময়ে বেশ সরস কথা কহিয়া লোককে হাসাইতে পারিতেন।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা — ১৮৬

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ইংরাজি ১৯২০ সালে মার্চ্চ মাসে পঞ্চকোটের রাজার একটি মোকর্দ্দমা পরিচালনার জন্য দাদা বর্দ্ধমানে যাইয়া প্রায় মাসাবধি কাল অবস্থান করেন। সে সময় তিনি বর্দ্ধমানে তাঁর বাল্যের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন। যে শ্যামসায়রের জলে ঝাঁপ খেলিয়া, সাঁতার কাটিয়া, ছেলেবেলায় তিনি কতই আমোদ পাইয়াছিলেন, তার ঘাটে প্রতি সন্ধ্যায় গিয়া বসিয়া থাকিতেন।

দাদা এক দিবস নিমন্ত্রিত হইয়া বর্দ্ধমান মহারাজার উদ্যান সম্মিলনে যাইলে, মহারাজ তাঁহাকে বলেন......'আপনার ছেলেবেলায় পড়্‌বার সময়, আর এখন, এই দুইবার বর্দ্ধমানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিন থাকা হ'লো বোধ হয়?'

বাড়ীতে আসিয়া দাদা মহারাজার কথা উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন ......"মহারাজ যখন আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন কি জানি কেন, সহসা একটা কেমন বিষাদের ভাব আমার মনে জেগে উঠ্‌লো! বোধহয় ছেলেবেলা এখানে স্কুলে যাদের সঙ্গে পড়েছিলাম, তারা সব একে একে চলে গেল। আমারও তো বয়স হয়েছে, কোন দিন যাই আর কি! বর্দ্ধমানে হয় তো এই শেষ আসা হলো!'......এই রকম সব ভাবায় হয় তো মনের ভেতরটা তেমন হয়েছিল।"

হায় দাদা! সে দিন আপনি অজানিতে নিজ মুখে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কে জানিত তাহাই আপনার বিধিলিপি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে! তা না হলে তখন আপনার সুস্থ হৃষ্ট-পুষ্ট কায়, হৃদয়ে যৌবনের উদ্যম দেখিয়া কে ভাবিয়াছিল যে, আপনার অন্তিমকাল এত সন্নিকট!

পঞ্চকোট রাজার যে মোকর্দ্দমায় দাদা বর্দ্ধমানে গিয়াছিলেন, ইংরাজি ১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসের মাঝা-মাঝি হাইকোর্টে সেই মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিবার সময়, একদা রাত্রি দুই ঘটিকার সময় সহসা তাঁহার বমি হইতে আরম্ভ হইল। সে সময় চিকিৎসায় অসুখের কিঞ্চিৎ উপশম হইল বটে, কিন্তু পর দিবস প্রাতে ডাক্তাররা আসিয়া রোগ পরীক্ষা পূর্ব্বক বলিলেন......'পীড়া সাঙ্ঘাতিক।'

তিন মাস ধরিয়া বিবিধ প্রকার চিকিৎসা চলিল, কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না। সহসা এক দিন দেখা গেল, তাঁর প্রলাপ আরম্ভ হইয়াছে। সচরাচর মানুষের যেরূপ প্রলাপ হয়, এ সে প্রলাপ নয়! পীড়াক্রান্ত হইবার সময় কোর্টে, পঞ্চকোটের মোকর্দ্দমায় যাহা সওয়াল জবাব করিতেছিলেন, এ তাহারই যথাযথ পুনরাবৃত্তি। একটি কথারও ভুল-চুক্ নাই।

হাইকোর্টে জজেদের সম্মুখে সওয়াল জবাব করিবার কালে দাদা তাঁহার চির অভ্যাস মত আপনার মুখের ও হস্ত সঞ্চালনের যেরূপ ভঙ্গিমা করিতেন, প্রলাপ-সওয়াল জবাবের কালে তাহারও কোন রূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। এরূপ প্রলাপ-সওয়াল্ জবাব

ক্রমান্বয়ে দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা চলিত। পুনরায় জ্ঞান ফিরিলে, পুস্তক পাঠ করিতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ইংরাজি ১৯২১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি বার ঘটিকার সময় তাঁহার জ্বর দেখা দিল! ডাক্তাররা মত প্রকাশ করিলেন, 'এই জ্বর মগ্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে।' কিন্তু জ্বর মগ্ন হইবার পূর্ব্বেই রাত্রি এক ঘটিকার সময় দাদার বিপুল জ্ঞানের লোপ হইল! বহু দীন-দরিদ্র, আত্মীয়-জন, বন্ধু-বান্ধবকে কাঁদাইয়া, তিনি অনন্ত নিদ্রায় চিরদিনের তরে অভিভূত হইলেন।

হিন্দুর চির-প্রচলিত প্রথামত দাদার বন্ধু-বান্ধব, ও আত্মীয়-স্বজন, তাঁহার পুষ্প-ভূষিত শবদেহ পবিত্র হরিনাম সংকীর্ত্তন সহকারে কালীঘাটের কেওড়াতলার শ্মশান ক্ষেত্রে বহিয়া লইয়া গিয়া, যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন।

প্রজ্বলিত চন্দন-চিতানলে দাদার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রিয় সুহৃদ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আলেকজেন্দ্রিয়ার পুস্তকাগার এবং উদন্তপুরের বৌদ্ধবিহার একসঙ্গে আবার নূতন করিয়া পুড়িয়া গেল, অশেষ গুণাধার একমাত্র পুত্রের বিয়োগে দেশমাতার ক্রোড় শূন্য হইল।

যাও দাদা! গরীয়সী জন্মভূমির একনিষ্ঠ সেবক, স্বদেশ-বৎসল দীন-দরিদ্র, অনাথ, আত্মীয়-পালক, পরহিত-ব্রত-পরায়ণ, দয়া-দাক্ষিণ্যের জীবিত আধার,······দাদা আমার যাও! চিরদিন কায়মনোবাক্যে যে নির্ব্বাণ কামনা করিতে, ভগবান্ তোমার

পবিত্র আত্মাকে অনন্ত কালের তরে তাঁহার চির শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া তোমার সে বাসনা যে পূর্ণ করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই।

দাদা বলিতেন,…"আমার শ্মশানের উপর একটা মন্দির করে, তাতে যেন লিখে দেওয়া হয়, "After life's fitful fever, he slept well."

দাদা যে উইল করেন, তাহার সার মর্ম্ম এই স্থানে দেওয়া হইল।

উইলে দাদা তাঁহার আত্মীয় স্ব , ভৃত্যবর্গ, ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের যথাযোগ্য অর্থ সাহায্য করা ব্যতীত পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কতক ভূসম্পত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেব-সেবাদির ব্যয়ের জন্য, এক লক্ষ টাকা তোড়্‌কণা গ্রামের জগবন্ধু স্কুল পরিচালনার নিমিত্ত, এবং উক্ত গ্রামের দীন-দরিদ্রদিগকেও মাসিক ও এককালীন দানের জন্য অর্থের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তিই, যাহার মূল্য সতের লক্ষ টাকারও অধিক হইবে, তিনি যাদবপুর টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন! তাঁহার বিস্তৃত পুস্তকাগারের আইন পুস্তক ব্যতীত যাবতীয় পুস্তক জগবন্ধু স্কুলে দান করিয়া গিয়াছেন।

জীবিত কালে দাদার দানের পরিমাণ নির্ণয় করা দুরূহ; তাঁহার ব্যক্তিগত বিপুল দান ব্যতীত বাঙ্গালার প্রত্যেক জনহিতকর কার্য্যেই তিনি অল্প-বিস্তর অর্থ-সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

পৈতৃক বসত-বাড়ী (বৰ্দ্ধমান)

পৃষ্ঠা—১৯১
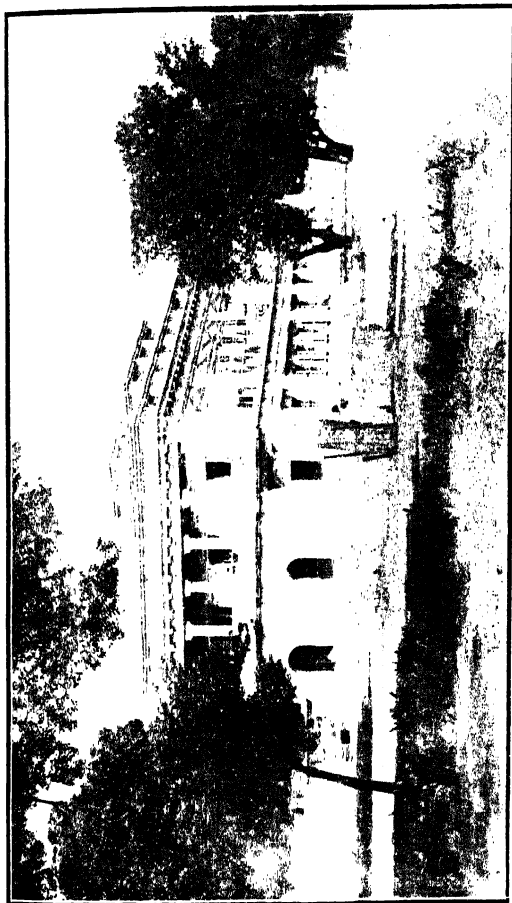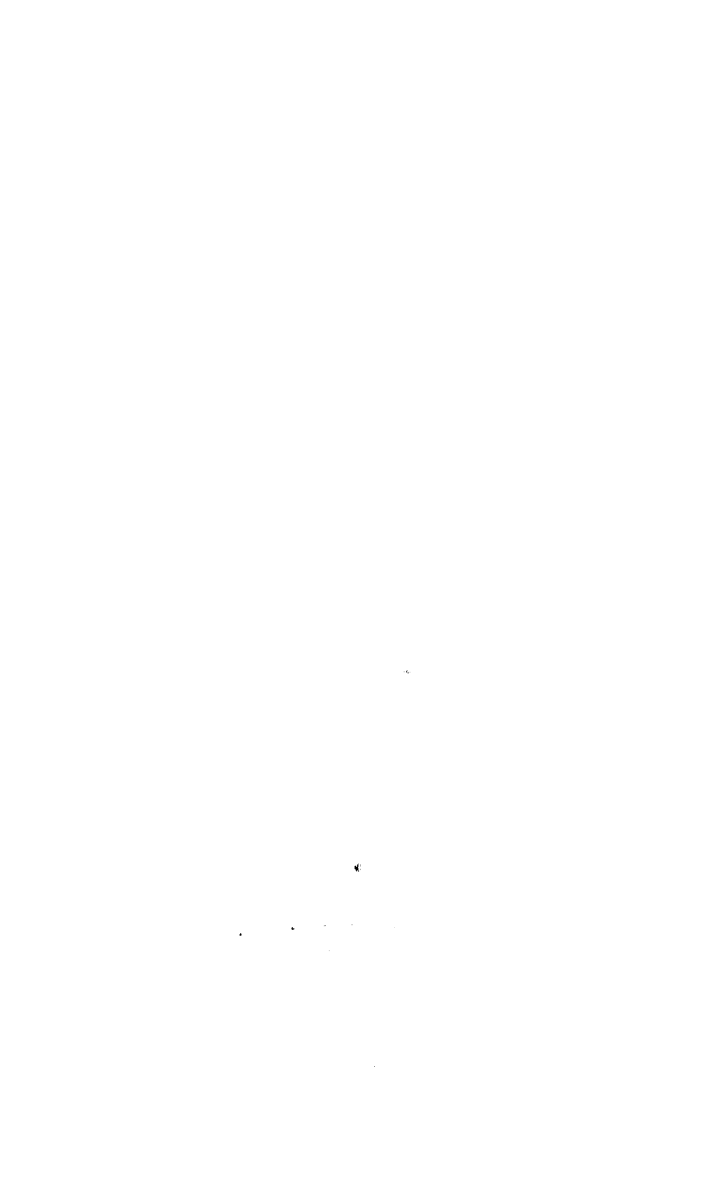
ভূমিকা

দাদা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবদ্দত্ত অপূর্ব্ব প্রতিভা ও আপনার ঐকান্তিক যত্ন, একাগ্রতা এবং উদ্যমের প্রভাবে জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সহৃদয়তা প্রভৃতি যে সব গুণের দ্বারা মনুষ্য মানবকুলের ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ প্রভৃতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, দাদার প্রকৃতিতে তাহা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

তাঁহার অসাধারণ দেশপ্রীতি, জাতীয় আত্ম-সম্মান-জ্ঞান, বদান্যতা তুল্যকর্ত্তব্য-বুদ্ধিও বিস্ময়কর। তিনি বলিতেন…… "গীতায় ভগবান বলেছেন, 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ।' আমি 'মামেকং' স্থানে কর্ত্তব্যকে স্থাপন করে জগতে চলি।" তাঁহার এ উক্তির যাথার্থত্যা তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারা গিয়াছিল।

১৯০৭ অব্দে বঙ্গ-রাষ্ট্র-বিপ্লবকালে গবর্ণমেণ্টের কঠোর বিদ্রোহ-আইনের যেরূপ তীব্রভাবে তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, বিপ্লবকারীদের কার্য্যেরও সেইরূপ ভাবে নিন্দাবাদ করিতে তিনি কুন্ঠিত হন নাই।

ইহার জন্য তাঁহার জনৈক পরিচিত লোক একদা তাঁহাকে বলেন…'আপনি যে এইরূপ ভাবে বিপ্লবকারীদের কার্য্যের নিন্দাবাদ করেন, আপনি কি বুঝেন না যে ইহাতে আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা আছে?' উত্তরে দাদা প্রদীপ্ত তেজে বলিয়াছিলেন, 'হাঁ, সে আমি বেশ জানি, বেশ বুঝি। কিন্তু

যাহা আমি আমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা হইতে কিছুতেই আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। জীবনহানির আশঙ্কা আছে বলিয়া আমি কখনই কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইব না, এ তুমি নিশ্চয় জানিও।'

"বিপ্লবকারীরা গুপ্ত হত্যার দ্বারা পাপ, অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে! পাপ অমঙ্গলের দ্বারা কখনই কোন মঙ্গল সিদ্ধ হইতে পারে না। আমি যখন আমার মটো (Motto) করিয়াছিলাম, Francas non Flectes. (ভাঙ্গব তবু নুইব না) সে সময় আমার মনে এ আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল যে আমি আমরণ কাল আমার এ মটোর (Motto) সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব কি না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি। আর অবশিষ্ট জীবনও যে ঐ ভাবেই কাটাইয়া যাইতে পারিব, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"বিপ্লবকারীরা সহজেই আমাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিতে সক্ষম হইতে পারে, কিন্তু জীবননাশের ভয় দেখাইয়া তাহারা যে আমাকে নোয়াইতে পারিবে না, এ বিষয়ে আমি স্থির-নিশ্চয় আছি।"

রাজপুরুষদেরও কি সহাস্য বদন, কি ভ্রূকুটি কটাক্ষ কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে তিলার্দ্ধ ভ্রষ্ট করিতে কখনও সমর্থ হয় নাই। তাঁহাদের ন্যায়-বিধানের প্রতি তিনি সাগ্রহে যেরূপ সহানুভূতি দেখাইতেন, তাঁহাদের অন্যায় বিধানেরও সেইরূপ তীব্রভাবে চিরদিন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অনমনীয় তেজস্বিতা ও

স্পষ্টবাদিতায় কি স্বদেশী, কি বিদেশী সকল সম্প্রদায়ের তুল্য রূপে শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পুত্র, কন্যা, কলত্র লইয়া মানব সংসারে সুখ-সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই বিপত্নিক হইয়াছিলেন। পুত্র কন্যাও তাঁহার ছিল না। কিন্তু সে কারণ তাঁহাকে কথনও অনুতাপ করিতে দেখা যায় নাই। ইহার জন্য মুহূর্ত্তের তরেও তিনি নিজ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা ভাব কথনও প্রকাশ করেন নাই।

বীণাপাণি বাগ্‌দেবীর আরাধনায় সারাজীবন নিয়ত ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি যে অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহার তুলনায় সকল প্রকার পার্থিব সুখই তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ প্রতীয়মান হইত।

তিনি আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী বিস্ময়কর প্রতিভা আইনের দিকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিলেও ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনার দ্বারা তিনি অসীম খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত সাহিত্যের দক্ষতা সম্বন্ধে কলিকাতার 'ইংলিশম্যান' নামক সংবাদপত্র একদা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,......"Those that had occasion to come in close contact with the illustrious object of this sketch, will bear ample testimony to the fact that Dr. Ghose's knowledge of the English language is equally profound. His speeches delivered either from his seat in the Legislative Council or from the Congress platform were always couched in the

finest language and must find place side by side with the utterances of the best English scholars. His epoch-making book on the Law of Mortgages in India is written in a style which can safely be compared with the style of the best writers in the English language. In fact Dr. Rashbehari Ghose is both a scholar and a lawyer and decidedly heads the list of those men who have made any mark in speaking and writing the English language in the country."

পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও উহাতে একান্ত অনুরাগী হইয়াও, এবং পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেও, দাদা কখন পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হন নাই। তিনি স্বদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ চিরদিন অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্তই সম্পূর্ণ হিন্দুমতে অনুষ্ঠিত হইত।

দানের জন্যই সাধুগণ উপার্জ্জন করেন; মহাজনের এই বচন তিনি জীবনে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি জনক-জননীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ, আত্মীয়বৎসল ও ভৃত্যদিগের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে শিশুসুলভ সরলতা ও কোমলতার প্রভা প্রতিফলিত হইত। এই সকলই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব।

তিনি জগতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক একজন প্রকৃত আদর্শ পুরুষের ন্যায়ই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
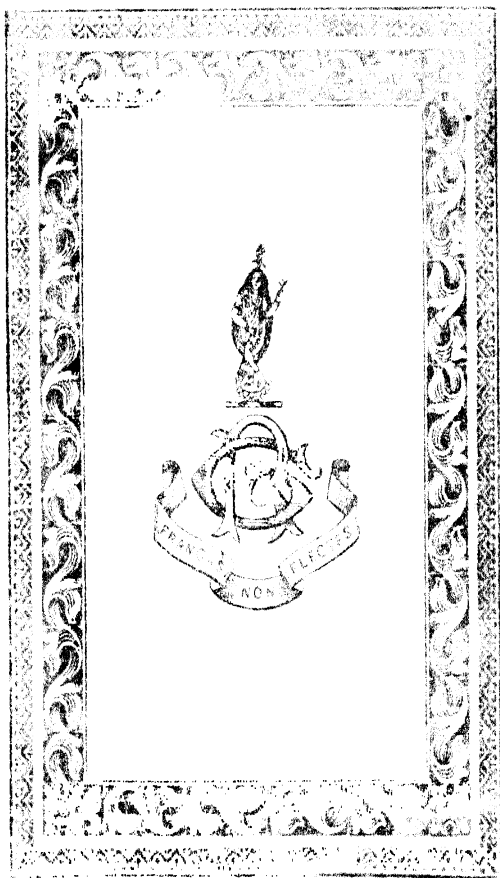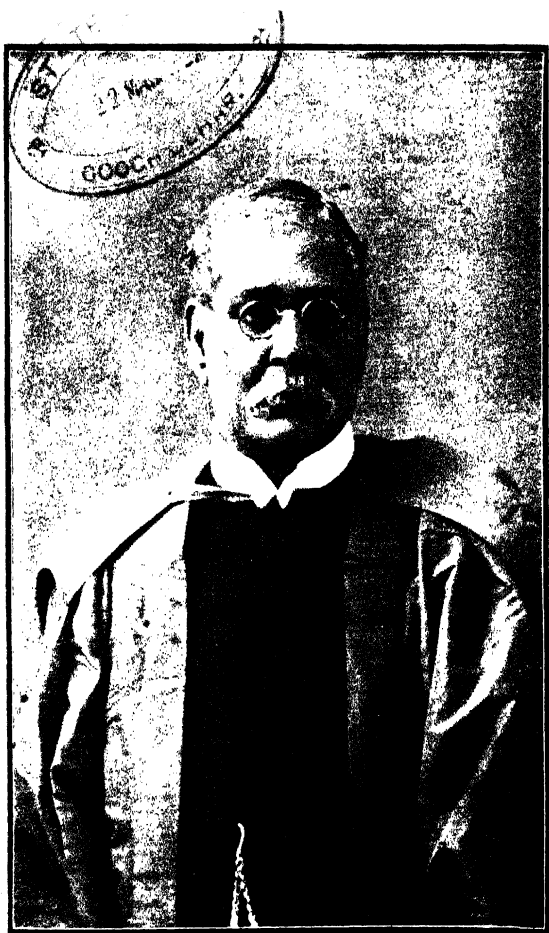
স্যার রাসবিহারী ঘোষ

ইং ১৯১১ সাল
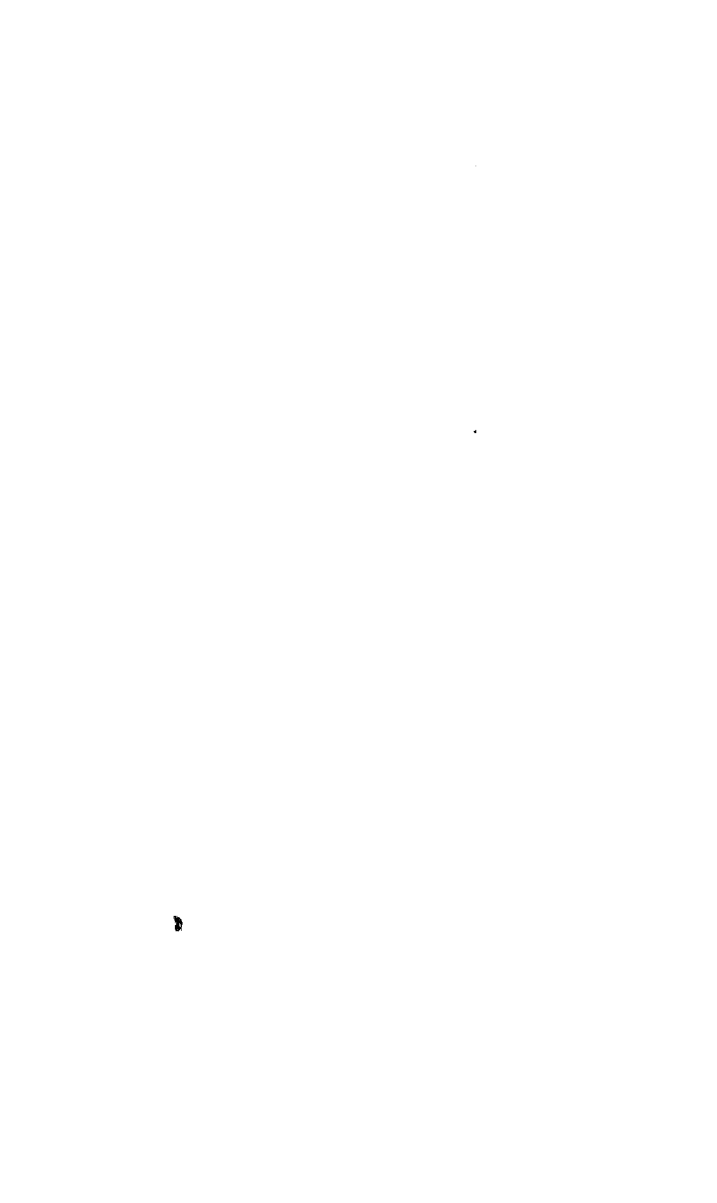
উৎসর্গপত্র

দাদা! আপনি আমায় যখন তখনই বলিতেন—"সুরেশ, তুই আমার জীবনচরিত লিখিস্।" কিন্তু এ বিষয়ে আমার শক্তি কতটুকু তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। আমার ন্যায় আবাল্য ভগ্ন-স্বাস্থ্য মূঢ়ের পক্ষে আপনার ন্যায় মহানুভবের জীবনচরিত লেখা পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘনের ন্যায় একেবারেই অসম্ভব! কিন্তু তবুও কেবল আপনার আদেশ পালনের জন্যই আমি এই জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিয়াও আপনারই মুখে আপনার আত্মজীবনী, যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া এই দাদার-কথা প্রকাশিত করিলাম। এবং ইহা আপনারই শ্রীকর-কমল উদ্দেশে অর্পণ করিলাম।

আশৈশব আপনার স্নেহনীড়ে পালিত, অকিঞ্চনের এই ক্ষুদ্র উৎসর্গ গ্রহণ করুন; আমি গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

শ্রীসুরেশ